﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾

"মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আত্মবিক্রয় করে থাকে। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।"

'ফিদায়ী অভিযানের'

বিষয়ে ইসলামের বিধান

এটি কি আত্মহত্যা নাকি শাহাদাহ বরণ?

বইটি লিখেছেন

শহীদ, আল-হাফিজ, মুজাহিদ শাইখ ইউসূফ ইবন সালেহ্ আল-উয়াইরী

(আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন)

মূল বইটি অনুবাদ করেছে

আযযাম পাবলিকেশন্স

পরবর্তীতে আবু কুতাইবাহ আশ-শামি (আল্লাহ তাকে হিফাযত করুন) এর কিতাব "আল-ইসাবাহ ফি তালাব আশ-শাহাদাহ"এর অনুসরনে এতে সম্পাদন, পূণঃসংশোধন এবং টিকা সংযোজন করেছে

আত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স

সূচী পত্র

<u>ভূমিকাঃ</u>

যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আলাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য, যিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন,

﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾

"আল্লাহ্ যদি একদল মানুষকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে সমগ্র পৃথিবী বিধ্বস্ত হয়ে যেত।"[১]

দূরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক দিক-নির্দেশনা দানকারী ইমাম, সাইয়্যেদুল মুরসালিন রসূলুলাহ্ সালালাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যিনি ঘোষণা দিয়েছেন,

"সেই মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন, আমার ইচ্ছে হয় যে, আমি আল্লাহর পথে (যুদ্ধ করে) নিহত হই, আবার জীবিত হই, আবার নিহত হই আবার জীবিত হই, আবার নিহত হই।"[২]

এবং তিনি আরও বলেছেন,

"তোমরা আমল করতে থাক, কারণ যাকে যে আমলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সেই কাজ সহজ করে দেয়া হবে।"[৩]

আলাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই উম্মাহর সম্মানে জিহাদের বিধান দিয়েছেন, যদিও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জানেন যে এটি আমাদের জন্য কতটা অপছন্দনীয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন,

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

---

[১] সূরা আল বাকারাহঃ ২৫১

[২] অনুরূপ শব্দ দ্বারা আল-বুখারী (৩৬, ২৭৯৭, ৭২২৬) এবং মুসলিম (১৮৭৬)-এ বর্ণিত হয়েছে। আল - আলবানীর 'সহীহ আত্ তারগীব' (১২৬৬, ১৩৫৪) এবং সহীহ আল জামী' (১৪৯১, ৭০৭৫) তে সহীহ বলা হয়েছে। আল ওয়াদীর 'আল জামই আস সহীহ' (২/৩১৯, ৩/১৭১, ৬/২৬৯) এবং 'আস-সহীহ আল মুসনাদ' (১০৫৩)- এ হাসান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। হাফিজ ইবনে আবদিল বার (রহীমাহুল্লাহ) 'আত-তামহীদ' (১৪/৩৪০) এ একে সহীহ বলেছেন।

[৩] অনুরুপ শব্দ দ্বারা আরও বর্ণিত হয়েছে আল বুখারী (৪৯৪৯, ৭৫৫১), মুসলিম (২৬৪৭, ২৬৪৯)। আল আলবানী 'আস সিলসিলাহ আস-সাহিহাহ' (৮৯৮) এবং 'সহীহ আল জামী' (১০৭৪) তে এটিকে সহীহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল-ওয়াদীই 'আল জামী' আস সাহীহ' (১/২৭৫, ৬/২৩৮, ৬/৩৪১) এবং 'আস সহীহ আল মুসনাদ' (৩৩৬) এ একে হাসান উল্লেখ করেছেন। হাফিজ ইবনে আবদিল বার তাঁর 'আত-তামহীদ' (৭/৬) এ একে সহীহ বলেছেন।

“তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে, যদিও তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয়। তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করছ মূলতঃ যা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। পক্ষান্তরে তোমরা এমন বিষয়কে পছন্দ করছ যা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুত আলাহ্ জানেন তোমরা জানো না।”[৪]

আজ মানুষ ইসলামের এই বিরাট নির্দেশটিকে অবহেলা করেছে এবং এর বিনিময়ে দুনিয়ার এই স্বল্প মূল্যের জীবনকেই বেছে নিয়েছে। তারা যার প্রতি মোহগ্রস্থ সেটিকেই নিজেদের জন্য কল্যাণকর মনে করছে, আর এ কারণেই আলাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যা আদেশ দিয়েছেন তা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

'কুফর'- এর প্রতিনিধিত্বকারী রাশিয়ান আর্মির বিরুদ্ধে চেচনিয়াতে যুদ্ধ করার তৌফিক দান করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আমরা প্রার্থণা করি, যেন তিনি আমাদেরকে শক্তি এবং সাহায্য দান করেন। আমরা আলাহ্ তা'আলার প্রশংসা করি এ কারণেও যে, তিনি আমাদেরকে বহুবার শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। আমাদের অনেকেই তাঁদের প্রতিজ্ঞা (যেমন শাহাদাত) পূর্ণ করেছেন এবং আমাদের অনেকেই এখনো অপেক্ষায় রয়েছেন।

শোষণ আর নির্যাতনের যাতাঁকলে পিষ্ট হবার পর জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সম্মান প্রদান করেছেন এবং আমাদের সঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অপার করুণায় আমাদের শহীদ ভাইয়েরা তাঁদের রক্ত দিয়ে এমন এক ইতিহাস তৈরি করে গিয়েছেন, যা নিয়ে আমরা গর্ব অনুভব করি। আমরা শুধু জানি যে, *'লা ইলাহ ইলালাহ'* -এই কালিমার জন্যেই তাঁদের রক্ত নির্গত এবং প্রবাহিত হয়েছে। আলাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্যেই আমাদের ভাইদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো টুকরো টুকরো হয়েছে এবং আল্লাহর শানেই তাদের মাথাগুলো ছিন্ন ভিন্ন হয়েছে। আর তাঁদের এই কুরবানী আমাদের শাহাদাতের আকাংখাকে আরও তীব্রভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে, যাতে আমরা আগামী কালই আমাদের প্রিয়তম মানুষ মুহাম্মাদ সালালাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম এবং তাঁর সাথীদের সাথে সাক্ষাত লাভ করতে পারি। আহা!! সেটি কত বড় সুখবর এবং আনন্দদায়ক ব্যাপার!! সেই ব্যক্তি কতই না সৌভাগ্যবান, যে তার রবের সাথে সাক্ষাত করবে এবং তার রবকে তার উপর সন্তুষ্ট দেখতে পাবে এবং সে উত্থিত হবে নবী, সিদ্দীক ও সালেহীনগণের সাথে এবং সঙ্গী হিসেবে তারা কতই না উত্তম!

আমরা আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আমাদের একেকজন তো উমাইর ইবনে আল হামাম আল আনসারিরই মত, যিনি অনবরত বলছিলেন,

“এই খেজুরগুলো খাওয়া পর্যন্ত যদি আমি জীবিত থাকি, তাহলে সে তো এক দীর্ঘ জীবন।”[৫]

---

[৪] সূরা আল বাকারাহঃ ২১৬

মুসলিমরা দূর্বল হয়ে যাবে- এই আশঙ্কা যদি আমরা না করতাম, তাহলে আমরা সকলে ইবনে আল হামাম এর মত করার জন্য পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতাম। কেননা, নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের প্রিয় মানুষদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মরিয়া হয়ে আছি। সুতরাং মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে আমরা প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাত লাভের পূর্ব পর্যন্ত যেন তাঁর পথে আমাদেরকে দৃঢ় রাখেন।

যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধক্ষেত্র রচনা করে চেচনিয়ার সাহসী যোদ্ধারা রাশিয়াকে ভীত-সন্ত্রস্ত করেছে, তার অন্যতম একটি দিক হল ফিদায়ী আক্রমণ। যাঁরা এ দায়িত্ব পালন করেন তাঁরা তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেন, যেন তাঁরা অতি দ্রুত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট থেকে পুরুস্কার পেতে পারেন। পৌত্তলিক কুফ্ফার শত্রুর হৃদয়ে কম্পন আর ত্রাস সঞ্চার করে তাঁরা অতি দ্রুত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রাহে নিজেদের সমর্পন করেন, অতি উচ্চ বাসস্থানের (জান্নাত) তীব্র আকুতির জন্য, সেই মহান সত্তা আলাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, যিনি সকল দয়ালু থেকে অতি বড় দয়ালু এবং সকল ক্ষমাকারীর থেকে সবচেয়ে বড় ক্ষমাকারী।

এই উম্মাহ এতদিন পর্যন্ত দ্বীনের জন্য কেবল পুরুষদের আত্মোৎসর্গের ইতিহাসই শুনে এসেছে, নারীদের আত্মোৎসর্গের সঙ্গে তারা পরিচিত নয়। মহান আলাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইচ্ছায় 'হাওয়া বারায়েভা' নামের এক তরুণী এমন একজন আত্মোৎসর্গকারী শহীদ হিসেবে ইতিহাসের পাতায় নিজেকে চিরস্মরনীয় করে রেখেছেন আর তাঁর আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন।

রাশিয়ানরা এখন সকল পথ থেকেই (নারী কিংবা পুরুষ) তাদের মৃত্যুর প্রহর গুনতে পারে এবং হাওয়া বারায়েভার মত নারীর কারণে ভীত - বিহ্বল হতে পারে। প্রতিটি পুরুষেরই তাঁর মত নারীর দিকে হিংসার(গিবতা) দৃষ্টিতে দেখা উচিত। প্রতিটি কাপুরুষেরই ধূলা - কাদায় জর্জরিত করে নিজের মাথা মাটিতে পুতে রাখা উচিত। কেননা, এই নারী যা করেছে তা খুব কম পুরুষই করতে পেরেছে। প্রতিটি সত্যের অনুসারীরই তাঁর মত নিজেদেরও বিলিয়ে দেয়া উচিত। আর এই উম্মাহর মাঝে এমন একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হওয়ায়, এই উম্মাহর গর্বিত হওয়া উচিত। আমরা নিশ্চিত, তাঁর মত তরুণী যে উম্মাহর মাঝে রয়েছে, আল্লাহর কসম, সেই উম্মাহ্ কখনোই কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হতে পারে না।

---

[৫] মুসলিম কর্তৃক তার সহীহ হতে বর্ণিত হাদিসের সূত্র ধরে, বদরের দিন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সেই জান্নাতের দিকে উঠে দাঁড়াও যার প্রশস্ততা আসমান এবং জমীনের সমান। উমাইর ইবনে আল হামাম (রদিআলাহু আনহু) বললেন , "হে আল্লাহর রসূল সালালাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম! জান্নাতের প্রশস্ততা কি আসমান এবং জমীনের সমান?" রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ"। উমাইর তখন বললেন, "বাখিন! বাখিন!" রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কোন জিনিসটি তোমাকে বাখিন বাখিন বলতে উদ্বুদ্ধ করেছে?" সুতরাং উমাইর (রদিআলাহু আনহু) তখন উত্তর দিলেন, "সেই আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রসূল সালালাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম! আমি এর একজন অধিবাসী হওয়ার আশা রাখি" এটি ছাড়া আর কোন ব্যাপার নয়"। সুতরাং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তাহলে নিশ্চিত তুমি তাদের একজন হবে।" পরে সে কিছু খেজুর নিল এবং খেতে শুরু করল। তখন সে আক্ষেপের সাথে বলল, "হায়! এই খেজুর খেতে যদি আমার দেরী হয়ে যায়, তাহলে নিশ্চিতভাবে এই জীবনের জন্য এটি এক দীর্ঘ সময়।" সুতরাং, তিনি খেজুর গুলি নিক্ষেপ করলেন এবং তাঁর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। এটি মুসলিম (১৯০১) কর্তৃক বর্ণিত এবং আল-আলবানীর 'সহীহ আত তারগীব' (১৩১২) কর্তৃক সত্যায়নকৃত।

যা হোক, আমরা যখন আমাদের বোনের এই আত্মোৎসর্গের ঘটনায় খোশ মনে ছিলাম এবং তাঁর জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাত এবং রহমত কামনা করছিলাম, সে সময় আমরা কিছু ই-মেইল পেলাম যা আমাদের আনন্দের মাঝে মেঘের ঘনঘটার সূচনা করল। এই প্রপাগান্ডাটি আমাদের শত্রু কিংবা বিদ্বেষী কারো থেকে নয়, বরং এমন লোকদের কাছ থেকে যাদের নিকট আমরা গঠনমূলক সদুপদেশ আশা করেছিলাম। তারা হাওয়া বারায়েভা এর মত বড় মুজাহিদাকে দোষী সাব্যস্ত করল এবং প্রপাগান্ডা করল যে, হাওয়া বারায়েভা এর মত এরকম আত্মহত্যা (!) অনুমোদনযোগ্য নয়। শুধু তাই নয়, তারা মত দিল যে, আমাদের ওয়েব সাইটে তাঁর পরিচিতি তুলে ধরাটাও অনুমোদনযোগ্য নয়, বরং আমাদের উচিত ছিল তাঁর সমালোচনা করা। তারা এ ক্ষেত্রে এমন কিছু দলীলের উল্লেখ করেছেন যাতে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, তারা তাদের প্রদত্ত দলীলের অপপ্রয়োগ করেছেন।

এই আলোচনায় আমরা এই বিষয়টি পরিষ্কার করব (ইনশালাহ্) যে, হাওয়া বারায়েভা এবং অনুরূপভাবে আব্দুর রহমান আশ-শিশানি, কাজী মাওলাদি, খাতিম, তাঁর ভাই আলী, আব্দুল মালিক এবং অন্যান্যরা আল্লাহর ইচ্ছায় চিরস্থায়ী জান্নাতে সবুজ পাখীর হৃদয়ে স্থান নিয়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আর্‌শ থেকে ঝুলন্ত ঝাড়বাতিতে তাঁদের আহার খাচ্ছেন।

আত্মোৎসর্গকারী ফিদায়ী আক্রমণের বিষয়ে আলোকপাত করার পূর্বে আমাদের উচিত হবে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে উত্তর দেওয়া।

প্রথমতঃ তুমি যদি না জানো, তাহলে তুমি কি জিজ্ঞেস করে নেবে না? কোন একটি বিষয়ে সুচিন্তিত এবং সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত বা ফাতাওয়া না জেনে কারো জন্যেই এ সম্পর্কে উল্টোপাল্টা মন্তব্য করা সঙ্গত নয়। যারা আমাদের সমালোচনা করেন তারা যদি এ বিষয়ে সর্ব প্রথম নিজেরা অনুসন্ধান করতেন, তাহলে তারা দেখতেন যে, তাদের উত্থাপিত অভিযোগের সঙ্গে শারীয়াহ-বিশারদ আলিমরা আদৌ একমত পোষণ করেননি। সুতরাং, এই বৈধ কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য কখনোই আমাদের সমালোচনা করা উচিত নয়।

দ্বিতীয়তঃ আমরা সত্য অনুসন্ধানী ভাইদের অনুরোধ করি, পূর্ববর্তী শারীয়াহ বিশারদ, ইমামদের রায়কে খন্ডন করার পূর্বে আমাদের সমালোচনা করবেন না।

তৃতীয়তঃ প্রিয় ভাই ও বোনেরা! প্রতিটি ফিদায়ী আক্রমণই বৈধ নয়, কিংবা সকল ফিদায়ী আক্রমণই নিষিদ্ধ নয়। বরং এ বিষয়ে রায়টি শত্রুর অবস্থা, যুদ্ধ পরিস্থিতি, সক্ষম শহীদের ব্যক্তিগত পরিস্থিতি এবং অপারেশনের নিজস্ব ধরণ বা উপাদানের উপর নির্ভর করে। এভাবে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ভালভাবে না জেনে-বুঝে কেউ এমন হামলা সম্পর্কে কোন মতামত দিতে পারে না। আর এতদ্ অবস্থা সম্পর্কে কেবল মুজাহিদদের নিকট থেকেই জানা যেতে পারে, কুফ্‌ফারদের থেকে নয়। সেক্ষেত্রে,

আমাদের অবস্থা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে না জেনে কিভাবে আমাদের বিরূদ্ধে আপনারা অজ্ঞতার অভিযোগ উথাপন করেন? এবং এই হামলাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন?[৬]

পরিশেষে, আল্লাহর কাছে প্রার্থণা করছি, তিনি যেভাবে পছন্দ করেন, যেভাবে রাজি-খুশী থাকেন, সেভাবে মুজাহিদদের সফলতা দান করেন এবং তিনি যেন অনেক শত্রুকে মেরে ফেলার পর তাঁর রাস্তায় আমাদের শহীদ হিসেবে কবুল করে নেন।

﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾

"প্রভাতই তো তাদের প্রতিশ্রুত সময়। প্রভাত কি খুব নিকটে নয়?"[৭]

---

[৬] শাইখ আবু কুতাইবাহ আশ-শামি বলেন, "মুজাহিদীন ভাইদের প্রতি এটি একটি বাধ্যতামূলক ব্যাপার যে, তাদের নিজেদের কাজগুলিকে আরও সুসংগঠিত এবং সুনিবদ্ধ করার নিমিত্তে কিছু বিষয় গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবেঃ যেখানে সর্বাধিক সংখ্যক শত্রু সেনার ক্ষতি সাধন সম্ভব এমন সামরিক টার্গেটে নিজেদের বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার মত সামরিক অপারেশন পরিচালনা করাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে মানব রচিত আইন যেখানে রচনা করা হয়, সেরকম মুশরিকী সংসদের মত টার্গেটে আঘাত করা, কিংবা এমন বিল্ডিং টার্গেট করা যেখানে হামলার পরেও তাওয়াগিতরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। কিন্তু এ রকম উপায় ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে যদি তাদের আক্রমন করা যায়, সেক্ষেত্রে এরকম ফিদায়ী অপারেশন চালানো উচিত নয়। এটি ভাইদের প্রতি একটি বাধ্যতামূলক অনুসৃত বিষয় যে, দুই-একজনকে হত্যা করতে এমন অপারেশন চালানো ঠিক নয়। এর কারণ হল- ঐ ভাই যেন দামী মুক্তার মত এবং এরকম ভাইদের সংখ্যা অনেক কম (যারা নিজেদের ইচ্ছায় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে দিতে ইচ্ছুক)। তাই এটি বাধ্যতামূলক যে, খুব ব্যাপক ও লোম হর্ষক বৃহৎ টার্গেট ছাড়া তাদের ব্যবহার না করা।

[৭] সূরা হুদঃ ৮১

আত্মোৎসর্গকারী ফিদায়ী আক্রমণের সংজ্ঞা এবং শত্রুর ওপর তার ফলাফলঃ

ফিদায়ী আক্রমণের বা আত্মোৎসর্গমূলক অপারেশন বলতে এমন অপারেশন বুঝায় যেখানে এক বা একাধিক ব্যক্তি তাদের থেকে অস্ত্রশস্ত্রে এবং সংখ্যাধিক্যে প্রবল শত্রুর বিরূদ্ধে অপারেশন পরিচালনা করে; যদিও তারা জানে যে এতে নিশ্চিতভাবে তাদের মৃত্যু ঘটবে।

সম্প্রতি এমন ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে যে, ব্যক্তির দেহ, যানবাহন বা স্যুটকেস বিস্ফোরক দ্বারা সজ্জিত করে শত্রুর ঘাটিতে অথবা গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় প্রবেশ পূর্বক হঠাৎ হামলা চালিয়ে শত্রু ব্যুহের সর্বোচ্চ ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে যথাযথ স্থানে বিস্ফোরিত করা হয়। সাধারণতঃ যিনি এই ঘটনাটি ঘটান তিনিই এতে সর্বপ্রথম মৃত্যুবরণ করেন।

আরেকটি কৌশল হল, কোন আর্মড মুজাহিদ যখন বাঁচার কোন প্রস্তুতি না নিয়ে কিংবা বাঁচার সম্ভাবনা উপেক্ষা করে শত্রুর ব্যারাকে অথবা মিলনস্থলে অতর্কিতে ঢুকে অনবরত গুলিবর্ষণ করে, উদ্দেশ্য থাকে যত বেশি সংখ্যক সম্ভব শত্রু নিধন করা, যখন তিনিও প্রায় নিশ্চিত যে, এতে তিনিও মারা যাবেন।[৮]

"আত্মঘাতী বোমা হামলা" বলে যে লেবেল সেঁটে দেয়া হয় তা ভ্রান্ত ও সঠিক নয়। মূলতঃ এই গালি টি আমাদের ভাইবোনদের এই কাজ হতে অনুৎসাহিত করার জন্য ইহুদীদের চক্রান্তের ফসল। পূর্ব এবং পশ্চিমের মাঝে কত বড় ব্যবধান! অসুখী মানসিকতা, ধৈর্য্যের অভাব এবং ঈমানের দূর্বলতার কারণে যে আত্মহত্যা করে, সে তো জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে এবং সে আল্লাহর লা'নত অর্জন করেছে। অন্যদিকে শাহাদাত বরণকারী ব্যক্তি ঈমানের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে পূর্ণ আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার সাথে নিজেকে আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে ইসলামের বিজয় আনয়ন করে এবং আল্লাহর বাণীকে বুলন্দ করে।

আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে দেখেছি, আত্মোৎসর্গকারী ফিদায়ী আক্রমণ ব্যতীত শত্রুর বিরূদ্ধে ফলাফল আনয়নের ক্ষেত্রে আর কোন অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট কৌশল নেই, যে কৌশল দিয়ে তাদের হৃদয়ে বেশি ত্রাস সঞ্চার করা যেতে পারে। একদিকে যেমন তা তাদের প্রচন্ড আঘাতে পর্যুদস্ত করে, অন্যদিকে তাদের উদ্যম ও প্রাণশক্তিকে বিপর্যস্ত করে তুলে। এর ফলে, ভীরুতার কারণে জনগণের সঙ্গে মেশা থেকে এবং জনগণকে শোষণ-নির্যাতন করা থেকে তারা বিরত থাকে এবং লুটপাট ও হেনস্থা করা থেকে দূরে থাকে। এই জাতীয় অপারেশন যাতে সংঘটিত না হতে পারে, সেদিকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে

[৮] আরেক ধরনের ফিদায়ী অপারেশন যা "শাহাদাতমূলক অপারেশনঃ শাহাদাতের সর্বোচ্চ চূড়া" নামক পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হল, "অথবা সে একাকী কোন বিস্ফোরক দ্রব্য শরীরে বহন না করেই শত্রুর কোন ঘাঁটি আক্রমন করার জন্য যায় যাতে মজুদ রয়েছে প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক দ্রব্য। এটি ধ্বংস করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না সে নিজে ঐ বিস্ফোরক দ্রব্যগুলির বিস্ফোরণ ঘটায় (গুলি করা বা এরকম কিছুর মাধ্যমে) যেখানে সে নিজে মাঝখানে থাকে (এবং এভাবে শাহাদাত বরণ করে)। শাহাদাতমূলক অপারেশনের অনেক ধরণ আছে যা আমাদের পক্ষে এখানে উল্লেখ করা এবং গণনা করা সম্ভব নয়। সুতরাং সে নিজেকে বিস্ফোরক কিংবা আগুনের মধ্যে (সুরা বুরুজের গর্তের লোকদের ঘটনার অনুরুপ) উৎসর্গ করে অথবা অনুরুপকোন পদ্ধতি অবলম্বন করে- নিয়মটি একই রকম এবং এর লক্ষ্যও একই (আল্লাহর বাণীকে উন্নীত করা এবং দ্বীনের কল্যাণের জন্য মুসলিমদের শত্রুদের ক্ষতি সাধন করা) - মৃত্যু অর্জনের উপায় বিভিন্ন রুপ কিন্তু মৃত্যু সর্বক্ষেত্রে একই।

ব্যস্ত থাকার কারণে অন্য অত্যাচার নির্যাতন থেকে মানুষ রেহাই পায়। সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যাঁর ইচ্ছায় ওদের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে, উপরন্তু, ওদের দশা এমন অবস্থায় পৌছেঁছে যে, খোদ পুতিন তার সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতর এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের উপর সমস্ত দায়ভার চাপিয়ে ওদের অভিযুক্ত করেছে এবং মন্ত্রনালয় দুটির উচ্চ পর্যায়ে ব্যাপক রদবদলের হুমকি দিয়েছে। যে ট্রুপগুলো ফিদায়ী আক্রমণ ভন্ডুল করতে সচেষ্ট বা তৎপর নয় তাদেরকে ময়লা-পচা পরিষ্কার, আহতদের শুশ্রুষা এসব কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। এই হল ওদের নৈতিক অবস্থা!

বস্তুগত পর্যায়ে এই অপারেশন শত্রুর জন্য বয়ে আনে মারাত্মক ক্ষতি, আর আমাদের জন্য সর্বনিম্ন ত্যাগ। শত্রুর ব্যাপক ক্ষতির তুলনায় এই ত্যাগ খুবই সামান্য। বস্তুতঃ শত্রুর বিস্ফোরকসমূহের ক্ষতি এবং যানবাহনগুলিকে যুদ্ধ পরিত্যক্ত জিনিস হিসেবে আমাদের প্রাপ্তির ব্যাপারটি যেন এমন যে, আমরা আমাদের পদ্ধতিতেই রাশিয়ানদের তা ফেরৎ দিতাম। এর মানবিক ত্যাগ হল একটি মাত্র জীবনের ত্যাগ, যে মূলতঃ শহীদ ও বীর আল্লাহর ইচ্ছায় সে সরাসরি জান্নাতে চলে গেছে। পক্ষান্তরে, শত্রুর জন্য ওদের ক্ষতির দিক সর্বোচ্চ। গত অপারেশনের পর ওদের নিহত ও আহতের সংখ্যা ছিল ১৬০০ এবং এর ফলে চেচনিয়াতে রাশিয়ান ফোর্সের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনাটি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।

এ সকল কিছু অর্জিত হয়েছে কেবল চারজন বীরের কারণে। আমরা দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করি এরকম অপারেশন অনবরত চলতে থাকলে রাশিয়ানরা আর বেশী দিন আমাদের ভূমিতে থাকতে পারবে না। হয় তারা আক্রমণের সহজ টার্গেটে পরিণত হতে পুনরায় জোটবদ্ধ হতে ভয় পাবে, নতুবা এই হামলাগুলি মোকাবিলার জন্য একত্রিত হবে। আলাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা চাইলে ফিদায়ী আক্রমণই তাদের ছিন্নভিন্ন করার জন্য যথেষ্ট হবে। যদি বাস্তবিক তারা বিষয়গুলোকে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে চায় প্রতিটি শহরে তাদের ৩,০০,০০০ সৈন্যের ট্রুপ লাগবে, আর তা কোন অতিরঞ্জন নয় ।

এতদসংক্রান্ত বিষয়ের দলিলসমূহঃ

আত্মোৎসর্গকারী ফিদায়ী আক্রমণের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আলিমগণের রায় পর্যালোচনা কিংবা কিছু ভুল ধারণা অপনোদনের আগে আমাদের জন্য সমীচীন হবে এ সংক্রান্ত বিষয়ে শারীয়ার কিছু দলীল-প্রমাণ পেশ করা। এ দলীল-প্রমাণগুলি অনুসরণ করে এ সংক্রান্ত আলোচনা করা এবং এর বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরা। আমরা ক্রমসজ্জিত দলীলসমূহের প্রতিটির পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা করব না, বরং বুখারী এবং মুসলিম শরীফকে মূল ভিত্তি ধরে অন্য হাদীসগ্রন্থগুলির রেফারেন্স উলেখ করব যা এ দলীলকে আরও বিশুদ্ধ প্রতিপন্ন করে।

একঃ

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

“আল্লাহ্ তা’আলা মু’মিনদের থেকে তাদের জান এবং মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন; তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, হত্যা করে এবং নিহত হয়। তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে এই সম্পর্কে তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর আছে? সুতরাং তোমরা সেই ব্যবসার জন্য আনন্দিত হও, যা তোমরা করেছ এবং এটাই তো মহা সাফল্য।”[৯]

সুতরাং, এই আয়াতটিই আল্লাহ্ তা’আলার সঙ্গে মুজাহিদদের পারস্পরিক দেনা-পাওনার মূল ভিত্তি। এই ব্যবসার জন্য মুজাহিদ ব্যক্তি যে মূল্যই দিতে প্রস্তুত থাকুক তাই অনুমোদনযোগ্য। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত এ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞার কোন দলীল উপস্থিত না করা যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা নিশ্চিতভাবে জায়েজ।

দুইঃ

﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

---

[৯] সূরা আত্-তওবাহঃ ১১১

“আল্লাহ্‌র হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে। আর আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।”[১০]

এই আয়াতটি নির্দেশ করে যে, শারীয়াহ অনুসারে শক্তির মাত্রা জাগতিক বস্তুর উপর নির্ভরশীল নয়।

তিনঃ

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾

“মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আত্মবিক্রয় করে থাকে। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।”[১১]

ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রহীমাহুল্লাহ) এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রদিআল্লাহু আনহু) এই আয়াতটি সম্পর্কে বলেন,

“এর অর্থ হল আল্লাহর হক (তাওহীদ) প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর পথে নিজেদের মৃত্যু পর্যন্ত জিহাদে অটল থাকার মধ্য দিয়ে তারা নিজেদেরকে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন।”[১২]

ইমাম ইবনে কাসীর (রহীমাহুল্লাহ) বলেন,

“অধিকাংশ তাফসীরকারকরা মনে করেন, এই আয়াতটি আল্লাহর পথে জিহাদে রত প্রতিটি মুসলিমের জন্য নাযিল হয়েছে। ... এবং হযরত হিশাম বিন আমের (রদিআলাহু আনহু) যখন কাফিরদের দুটি ব্যুহ ভেদ করে তাদের মধ্যে ঢুকে পড়েন এবং একাকীই তাদের উপর আক্রমণ চালান, তখন কতক মুসলিম তাঁর এই আক্রমণকে শারীয়াহ বিরোধী মনে করেন। কিন্তু হযরত উমার (রদিআলাহু আনহু) এবং হযরত আবু হুরাইরা (রদিআলাহু আনহু) প্রমূখ সাহাবীগণ (যারা এই আক্রমণকে শারীয়াহ বিরোধী মনে করেছিলেন) ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করেন এবং এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।”[১৩]

ইমাম আল কুরতুবী (রহীমাহুল্লাহ) বলেন, “হাসান আল বাসরী (রহীমাহুল্লাহ) বলেন,

‘তোমরা কি জান কাদের সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয়েছে? এটি সেই মুসলিমদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা কাফিরদের মুকাবিলা করে এবং বলে, ‘তুমি লা ইলাহা ইলাল্লাহ্ বল, যদি তুমি তা বল, তাহলে তুমি এবং তোমার সম্পদ আমার পক্ষ থেকে

[১০] সূরা আল-বাকারাহঃ ২৪৯

[১১] সূরা আল-বাকারাহঃ ২০৭

[১২] তাফসীর ইবনে আবি হাতীম (১/৪৩)

[১৩] তাফসীর ইবনে কাসির (১/২১৬) এবং ইবনে শায়বার মুসান্নাফ (৫/৩০৩, ৩২২) এবং সুনান আল বায়হাকী (৯/৪৬)

নিরাপদ' এবং কাফির যখন তা বলতে অস্বীকার করে তখন মুসলিমটি বলে 'আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আমি নিজেকে আল্লাহর কাছে বিক্রি করব।' অতপর সে সামনে এগিয়ে যায় এবং তার মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকে।'"[১৪]

উলিখিত সাহাবা (রদিআলাহু আনহু) কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুসারে, যে আল্লাহর জন্য নিজেকে বিক্রি করে তার এই কাজকে কখনোই আত্মহত্যা হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না, এমনকি সে যদি বর্ম পরিধান না করেই এক হাজার হিংস্র শত্রু যোদ্ধার দিকে ধাবিত হয় এবং মৃত্যু বরণ করে।

চারঃ

সূরা আল বুরূজে উল্লেখিত গর্তের মানুষদের সম্পর্কে সহীহ্ মুসলিমে জনৈক বাদশাহ্ এবং বালকের যে ঘটনাটি হাদীসে রয়েছে তা এ রকমঃ

"... অতঃপর জনৈক বালককে হাজির করা হল। তাকে বলা হল তুমি তোমার দ্বীন ত্যাগ কর। সে প্রত্যাখ্যান করল। অতঃপর তাকে তার একদল লোকের হাতে দেয়া হল এবং বলা হল যে, এই বালককে অমুক পাহাড়ে নিয়ে যাও এবং পাহাড়ের একেবারে চূড়ায় উঠে যাবে। যদি সে তার দ্বীন ত্যাগ করে তাহলে ভাল, নতুবা তাকে পাহাড় হতে ফেলে দেবে। লোকেরা তাই করল। যখন তাকে নিয়ে তারা পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গেল তখন ঐ বালক দোয়া করল, হে আল্লাহ্! তুমি যেভাবে চাও,আমার বিরুদ্ধে তাদের ব্যাপারে যথেষ্ট হয়ে যাও। অতঃপর পাহাড় প্রচন্ডভাবে কেঁপে উঠল এবং ঝাঁকুনি দিল। এতে তারা সকলেই পাহাড় হতে পড়ে মারা গেল। বালক পায়ে হেঁটে বাদশাহর নিকট এল। বাদশাহ্ বলল, তোমার সাথে যারা গিয়েছিল তারা কোথায়? বালক বলল, তাদের হাত থেকে আল্লাহ্ আমাকে রক্ষা করেছেন। বাদশাহ্ আবার তার সৈনিকদের হুকুম দিল যে, এই বালককে একটি নৌকায় তুলে নাও, অতঃপর যখন সাগরের মাঝে চলে যাবে, তখন যদি সে তার দ্বীন ত্যাগ করে তাহলে ভাল, নতুবা তাকে সমুদ্রে ফেলে দাও। লোকেরা তাকে নিয়ে সমুদ্রের মাঝখানে চলে গেল। বালক বলল, হে আল্লাহ্! তুমি যেভাবে চাও,আমার বিরুদ্ধে তাদের ব্যাপারে যথেষ্ট হয়ে যাও। সঙ্গে সঙ্গে ঐ নৌকা উল্টে গেল। ওরা সব মরে গেল। বালক হাটতে হাটতে বাদশাহর দরবারে চলে আসল। বাদশাহ বলল, ওহে! তোমাকে যারা নিয়ে গেল তারা কোথায়? বালক বলল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন আর তাদের ধ্বংস করেছেন। এরপর বালক বলল, তুমি এভাবে চেষ্টা করে আমাকে মারতে পারবে না, যতক্ষণ না আমার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ কর। বাদশাহ বলল কী সেই কাজ? বালক বলল, তুমি সব মানুষকে একটি বড় মাঠে জড়ো করবে এবং একটি উচুঁ গাছে শুলিতে আমাকে চড়াবে, অতঃপর আমার তীরের থলি হতে একটি তীর বের করবে, এরপর তীরটিকে ধনুকের রশিতে লাগাবে। অতপর বলবে, 'এই বালকের রব আলাহর নামে তীর নিক্ষেপ করছি।' এভাবেই তুমি আমাকে হত্যা করতে পারবে। বাদশাহ তাই করল। সমস্ত মানুষকে একটি মাঠে জমা করল।

---

[১৪] তাফসীর আল কুরতুবির এই আয়াতের ব্যাখ্যা

অতঃপর বালককে গাছের শাখায় চড়ানো হল। এরপর বালকের তীরের থলি থেকে একটি তীর হাতে নিয়ে ধনূকের সাথে লাগালো। তারপর বলল, 'আমি এই বালকের রব আল্লাহর নামে তীর নিক্ষেপ করছি। এই বলে তীর নিক্ষেপ করল। তীর গিয়ে বালকের মাথার একপাশে বিদ্ধ হল। অতঃপর বালক তার তীরবিদ্ধ স্থানে হাত রেখে মৃত্যু বরণ করল। এবং এভাবেই তার মৃত্যু ঘটল। এই ঘটনা দেখে লোকেরা বলে উঠল 'আমরা এই বালকের রব এর উপর ঈমান আনলাম। আমরা এই বালকের রব এর উপর ঈমান আনলাম।' বাদশাহকে তার লোকেরা গিয়ে জানাল, আপনি যা আশঙ্কা করেছিলেন তাই হয়েছে, মানুষতো সব ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে। বাদশাহ তার অনুসারীদের হুকুম দিলেন যে, প্রতিটি রাস্তার মুখে মুখে বিশালাকার গর্ত তৈরি কর। বাদশাহর হুকুম অনুসারে প্রতিটি রাস্তার মুখে বিশাল আকারের গর্ত তৈরি করা হল এবং তাতে আগুন জ্বালানো হল। অতঃপর ঘোষণা করা হল 'যারা তাদের দীন (ইসলাম) ত্যাগ না করবে তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ কর। তাই করা হল। এক পর্যায়ে এক নারীর পালা আসল। তার সঙ্গে ছিল তার দুধের শিশু। নারীটি যখন ইতস্তত: করছিল তখন তার দুধের শিশু মায়ের কোলে বসে বলল, 'মা তুমিও আগুনে ঝাঁপ দাও। নিশ্চয়ই তুমি হক্ব দ্বীনের উপর রয়েছো' ।"[১৫]

এই হাদীসে দেখা যায়, দ্বীনের স্বার্থেই এবং দ্বীনের কল্যাণের নিমিত্তেই এই বালকটি নিজেকে হত্যা করার উপায় বলে দিয়ে নিজেকে উৎসর্গ করেছিল। এটি নির্দেশ করে যে, দ্বীনের স্বার্থে এরকম আত্মোৎসর্গ বৈধ এবং তা আত্মহত্যা হিসেবে বিবেচিত হয় না। স্মরণ রাখা দরকার, এরকম করার জন্য সে কোন ওহী পায়নি কিংবা তাঁর এমন সিদ্ধান্তের পরিণতি কেমন হবে তাও সে আগে থেকে জানতো না। উপরন্তু, আমাদের শারীয়ায় বালকের এই ত্যাগের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে।

পাঁচঃ

ইমাম আহমাদ ইবনে আব্বাসের (রদিআল্লাহু আনহু) থেকে তাঁর মুসনাদে[১৬] বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"মিরাজের রজনীতে যে রাতে আমাকে ভ্রমণ করানো হয় আমি একটি মনোমুগ্ধকর সুঘ্রাণ অনুভব করলাম। আমি বললাম হে জিবরাঈল! এত সুন্দর এই ঘ্রাণ কিসের? জিবরাঈল বললেন, এ হল ফিরআউনের কন্যার চুল আঁচড়ানো বাদী এবং তাঁর সন্তানদের সুঘ্রাণ। আমি বললাম, এর কারণ কি? জিবরাঈল উত্তর দিলেন, একদিন তিনি ফিরআউনের মেয়ের মাথার চুল আঁচড়াচ্ছিলেন; হঠাৎ তার চিরুনিটি হাত থেকে পড়ে যায়। পড়ে যাওয়ার সময় তিনি বিসমিল্লাহ বলেন। এই দৃশ্য দেখে ফিরআউনের মেয়ে বলল, তুমি কি আমার পিতার নাম উচ্চারন করেছ ? তিনি বললেন, না তোমাদের পিতা নন, বরং আমার এবং তোমাদের পিতার যিনি রব (আল্লাহ)। ফিরআউনের মেয়ে বলল, বাবাকে এটা বলে দিব কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, বল।

[১৫] মুসলিম (১৩০)এটি তার কিতাবের শব্দ। আহমাদ কর্তৃকও তা উদ্ধৃত হয়েছে (৬/১৭)। আত তিরমিযী (৩৪০) এবং আন-নাসাঈ "তুহফাত্ আল আশরাফ" (৪/১৯৯)। পুরো হাদীসের জন্য এবং এর ব্যাখ্যার জন্য আত্-তিবীয়ান পাবলিকেশন্স এর "দি পিপ্‌ল অব ডিচ্" বইটি দেখা যেতে পারে।

[১৬] আল-মুসনাদ (১/৩১০) এবং অনুরুপ বর্ণনা ইবনে মাজাহ তেও (৪০৩০) রয়েছে।

মেয়ে গিয়ে ফিরআউনকে বলে দিল। ফিরআউন তাঁকে ডাকল এবং বলল, আমি ব্যতীত তোমার কি কোন রব আছে? তিনি বললেন, অবশ্যই তোমার এবং আমার রব আলাহ্। একথা শুনে ফিরআউন পিতলের বড় হাড়িতে আগুন গরম করতে বলল। যখন হাড়ি গরম হয়ে গেল ,তখন ফিরআউন তাঁকে এবং সন্তানদের ঐ উত্তপ্ত হাড়িতে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিল। তিনি বলল, তোমার কাছে আমার একটি দাবী আছে। ফিরআউন বলল, কী দাবী বল। তিনি বললেন, আমি চাই যে, আমার ও আমার সন্তানদের হাড্ডিগুলো একটি কবরে একত্রে দাফন করবে। ফিরআউন বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই এটি আমার প্রতি তোমার অধিকার। এরপর তাঁর সামনে তাঁর সন্তানদের একে একে প্রত্যেককে সেই হাড়িতে নিক্ষেপ করা হল। এক পর্যায়ে তাঁর দুধের শিশুর পালা আসল। এই নারী এবার একটু যেন বিচলিত হলেন। তখন দুধের শিশুটি বলল, মা তুমি দ্রুত ঝাঁপ দাও, কারণ এই পৃথিবীর শাস্তি আখিরাতের শাস্তির তুলনায় একেবারেই তুচ্ছ। সঙ্গে সঙ্গে সে (নারী) তাতে ঝাঁপ দিল।”[১৭]

পূর্ববর্তী “গর্তের লোকদের” ঘটনায় শিশুটি যেমন তার মাকে আগুনে ঝাঁপ দিতে বলেছে, এই হাদীসের ঘটনাটিতেও দেখা যায় শিশুটিকে আল্লাহ্ তা’আলা কথা বলিয়েছেন। দ্বীনের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করা যদি অনুমোদনযোগ্য না হত, আমাদের শারীয়ায় এই কাজটির এত ভূয়সী প্রশংসা করা হত না। আর এই শিশুটির কথা বলে উঠার বিষয়টি কুদরতী চিহ্ন ব্যতীত কিছু নয় যা এই কাজটির ব্যাপক তাৎপর্য বহন করে।

ছয়ঃ

আসলাম আবি ইমরান হতে বর্ণিত,

*“আমরা রোম শহরে ছিলাম। ওরা আমাদের উদ্দেশ্যে একটি বিশাল বাহিনী বের করল এবং মুসলমানদের থেকেও একটি বিশাল বাহিনী বের করা হল। মুসলিম বাহিনীর সৈনিকদের থেকে একজন ব্যক্তি অস্ত্র তুলে নিয়ে রোমানদের কাতারে ঢুকে পড়লেন। তখন কিছু লোক চিৎকার করতে লাগলেন যে, সুবহানাল্লাহ্! সে তো নিজেকে নিজের হাতে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। (এর দ্বারা তারা কুরআনের আয়াত, **“তোমরা নিজেদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না।”** এই আয়াতকে ইঙ্গিত করছিলেন।) তখন আবু আইয়ুব আনসারী (রদিআলাহু আনহু) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, “হে লোক সকল! তোমরা এই আয়াতের এই ব্যাখ্যা দিচ্ছ! অথচ এই আয়াত নাযিল হয় আমাদের আনসারদের উদ্দেশ্যেই। (ব্যাপার ছিল এই যে) যখন আল্লাহ্ তা’আলা ইসলামের বিজয় দান করে ইসলামকে মহিমান্বিত করলেন এবং ইসলামের সাহায্যকারীদের সংখ্যা অনেক হয়ে গেল, তখন আমাদের কিছু লোকেরা গোপনে রসূলুলাহ্ সালালাহু আ’লাইহি ওয়া সালাম-কে না জানিয়ে বলতে লাগল যে, আমাদের সম্পদ তো বিনষ্ট হয়ে গেছে। আর এখন তো আলাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা ইসলামের বিজয় ও সম্মান দান করেছেন, ইসলামের সাহায্যকারীও অনেক হয়েছে। সুতরাং এখন যদি আমরা আমাদের সম্পদ গুছানোর কাজে হাত দিতাম*

[১৭] ইমাম আহমাদ শাকির (রহীমাহুলাহ্) তাঁর ‘তাহকীক অব আল-মুসনাদ’ (৪/২৯৫, ২৮২২) গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন।

এবং আমাদের যে ক্ষতি হয়ে গেছে তা পুনঃগঠনে যদি মনোযোগ দিতাম! তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নাবীর প্রতি এ আয়াত নাযিল করে তার প্রতিবাদ করলেন,

﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

"... আর তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং নিজেদের ধ্বংসের মাঝে নিক্ষেপ কর না।"[১৮]

সুতরাং এখানে যুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া এবং সম্পদ পুনঃগঠনে আত্মনিয়োগ করাই ছিল ধ্বংস। যুদ্ধের ময়দানে শত্রু সেনাদের মাঝে ঢুকে পড়া ধ্বংস নয়। এরপর আবু আইয়ুব আনসারী (রদিআল্লাহু আনহু) সব সময় যুদ্ধের ময়দানেই কাটাতেন এবং শেষ পর্যন্ত কুস্তুনতুনিয়ায় তাঁর দাফন হয়।[১৯]

বায়হাকী-ও এটি অন্তর্ভূক্ত করেছেন এবং তাঁর সুনানের অপর এক বর্ণনায় **"এককভাবে আল্লাহর শত্রুদের ভূমিতে লড়াই করার অনুমোদন"** শীর্ষক অধ্যায়ে শত্রু দলের বিরূদ্ধে একাকী অগ্রসর হবার বিষয়টির অনুমোদনের দলীল হিসেবে পেশ করেছেন, এমনকি যদি এর ফলাফল এমনও হয় যে, এর ফলে শত্রু তাকে নিশ্চিত মেরে ফেলবে।

এই হাদীসে আবু আইয়ুব আনসারী (রদিআল্লাহু আনহু) এই আয়াতের (সূরা আল-বাকারাহঃ ১৯৫) ব্যাখ্যা করেন যে, এটি তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যে ব্যক্তি শত্রু ব্যূহ ভেদ করে ঠেলে এগিয়ে যায়, যদিও লোকদের মনে এই ধারণা হয় যে, সে নিজেকে ধ্বংস করেছে। সাহাবাগণ মৌনভাবে তার এই ব্যাখ্যাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং গ্রহণ করেছেন।

সাতঃ

মুআজ ইবনে আফরাহ (রদিআল্লাহু আনহু) বললেন,

"হে আল্লাহর রসূল! কোন কাজ আল্লাহকে হাসায়?" রসূলুলাহ্ সালাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম বললেন, "বর্ম ব্যতীতই কারও শত্রুর মধ্যে ঢুকে যাওয়া। একথা শুনে তিনি তার শরীর হতে লোহার পোষাক খুলে ফেলে দিলেন এবং লড়াই শুরু করে দিলেন এবং এমন অবস্থায়ই তিনি শহীদ হয়ে যান।"[২০]

[১৮] সূরা আল বাকারাহঃ ১৯৫

[১৯] আবু দাউদ (৩/২৭) এবং আত্-তিরমিযী (৪/২৮০) (আত তিরমিযী এটিকে সহীহ রায় দিয়েছেন) এটি বর্ণনা করেছেন এবং আল-আলবানী তাঁর "আস-সিলসিলাহ আস-সাহিহাহ"(১৩) এবং 'সহীহ আত তারগীব' (১৩৮৮) গ্রন্থে এটিকে সহীহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আরও দেখুন আল ওয়াদি "আল-জামি আস সাহিহ' (৩/২০০, ৪/১২৬, ৩৫৭, ৩৮১, ৫/৪২২, ৪২৩, ৪৮২) এবং 'আস সাহিহ আল মুসনাদ' (১৪০, ৩২৭) অনুরুপ বর্ণিত হয়েছে ইবনে হাজাম এর 'আল মুহাল্লা' (৭/২৯৪) এবং ইবনে হাজার এর 'আল ইসাবাহ' (৩/১২২) তে। আরও দেখুন 'ফাতহ আল বারী' (৮/৩৩-৩৪)

[২০] ইবনে আবি শায়বাহ এর 'মুসান্নাফ' (৫/৩৩৮)। এবং অন্য একটি বর্ণনায়, "বদরের দিন যখন লোকেরা যুদ্ধ করার জন্য উপনীত হল, আউফ ইবনে আল হারিস বললেন, "হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহকে বান্দার কোন কাজটি হাসিয়ে থাকে?" তিনি উত্তর দিলেন "তিনি যখন তার বান্দাকে কোন বর্ম ব্যতীত শত্রুর

এই হাদীসটি এবং এর পরের আরেকটি হাদীস থেকে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, জিহাদের অপারেশনের এমন বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য বা নীতি রয়েছে যেখানে এটি মোটামুটি নিশ্চিত যে, এতে কেউ কেউ নিহত হবে এবং এই বিশেষ নীতি অনুসারে এমন কিছু বৈধ যা সাধারণ অবস্থায় নিষিদ্ধ ।

আনাস বিন মালিক (রদিআল্লাহু আনহু) এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল,

"ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমি যদি মুশরিকদের ব্যুহ ভেদ করে ঠেলে ভিতরে ঢুকে যাই এবং যদি আমার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত লড়াই করে যাই আমি কি জান্নাতে যেতে পারব?" নাবী সালাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ" । অত:পর লোকটি মুশরিকদের ব্যুহ ভেদ করে ভেতরে ঢুকে গেল এবং তার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত লড়াই করে গেল ।"[২১]

আরও বর্ণিত আছে যে, ওহুদের দিনে উমর ইবনে খাত্তাব (রদিআল্লাহু আনহু) তাঁর ভাই যায়েদ বিন খাত্তাবকে বললেন যে,

"আমার ভাই! তুমি আমার বর্মটি নাও ।" যায়েদ উত্তরে বললেন, "আমি সেই শাহাদাত কামনা করি যা তুমিও কামনা কর ।" সুতরাং তারা উভয়ই সকল বর্ম পিছনে রেখে দিল ।"[২২]

আটঃ

রসূলুলাহ্ সালাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম বলেন,

"ঐ শহীদগণই সর্বোত্তম যারা প্রথম সারিতে যুদ্ধ করে । তারা তাদের মুখ অন্য কোন দিকে ঘুরায় না, যে পর্যন্ত না তারা মৃত্যু বরণ করে । এঁরা হল তারাই, যারা জান্নাতের সর্বোচ্চ মনযিলে উড়তে থাকবে; তোমাদের রব তাদের দেখে হাসবেন এবং যদি তোমাদের রব কোন বান্দার দিকে তাকিয়ে হাসেন, তাহলে তার আর কোনও হিসাব নাই ।"[২৩]

নয়ঃ

ইবনে মাসউদ (রদিআল্লাহু আনহু) এর সূত্রে আহমাদ তাঁর "মুসনাদ" এ বর্ণনা করেন, নাবী সালাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম বলেছেন,

---

ভিতরে ঢুকতে দেখেন । অতঃপর আউফ ইবনে আল হারিস তাঁর বর্ম ফেলে দিলেন এবং তিনি এগিয়ে গেলেন এবং শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন । আশ শাওকানি তার 'নাইল আল আওতার'(৭/২১২) এবং ইবনে হাজার তার 'আল-ইসাবাহ'(৩/৪২) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন ।

[২১] হাকীম কর্তৃক বর্ণিত । ইমাম আশ-শাওকানীর 'নাইল আল আওতার'(৭/২১২) দ্রষ্টব্য

[২২] আত-তাবারানী কর্তৃক বর্ণিত এবং আল হায়সামির "শাহাদাতের পরে" অধ্যায়ে 'মুজমা আজ-জাওয়ায়ীদ' গ্রন্থে বর্ণিত । এবং আল-হায়সামি বলেন, তাবারানী দ্বারা বর্ণিত এবং বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য" । ইবনে আবদিল বার এর "আল-ইসতিয়ার' দ্রষ্টব্য ।

[২৩] ইবনে আল মুবারক এর 'কিতাব আল জিহাদ'(১/৮৫) । এবং অনুরুপ শব্দ দ্বারা ইমাম আহমাদ, আবু ইয়ালা, আত্-তাবারানি এবং সাঈদ ইবনে মানসূর এটি বর্ণনা করেছেন । আলবানী কর্তৃক তাঁর 'সহীহ আল জামী'(১১০৭) এবং 'আস সিলসিলাহ আস সাহিহাহ (২৫৫৮) গ্রন্থে সহীহ ঘোষিত হয়েছে ।

“আল্লাহ্ তা’আলা দুই ব্যক্তির কাজে আশ্চর্য হন। এক হল ঐ ব্যক্তি যে তার বিছানা-পরিজন পরিত্যাগ করে সলাতের জন্য লাফ দিয়ে উঠে এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন, ‘তোমরা আমার এই বান্দাকে দেখ, আমার কাছে যা আছে তার প্রতি আশাবাদী হয়ে সে তার বিছানা-পরিজন পরিত্যাগ করেছে’। এবং আরেকজন হল ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হল এবং তার সাথীরা পরাজিত হল। অতঃপর সে জানে যে, এই পরাজয় সত্ত্বেও সামনে অগ্রসর হবার পরিণতি কি? তারপরও সে অগ্রসর হল এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেল। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলবেন, ‘তোমরা আমার এই বান্দার প্রতি দেখ, সে আমার নিকট যা রয়েছে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেল’।”[২৪]

ইবনে আন-নুহাস (রহীমাহুল্লাহ) মন্তব্য করেন,

“যদি এটি ব্যতীত আর কোনও সহীহ হাদীস না থাকে, তথাপি তা শত্রু ব্যূহে ঢুকে পড়ার বিষয়ে দলীল হিসেবে যথেষ্ট।”[২৫]

দশঃ

রসূলুল্লাহ্ সালাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সালাম বলেছেন,

“তিন ধরনের লোককে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা ভালবাসেন। ... অতঃপর যে তার গর্দানকে শত্রুর সামনে অগ্রসর করে দেয়। শেষ পর্যন্ত হয় সে শহীদ হয়ে যায় অথবা তার সাথীদের জন্য বিজয় ছিনিয়ে আনে।”[২৬]

এবং অন্য একটি বর্ণনায় রসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সালাম বলেন,

“তিনজন লোক আল্লাহর ভালবাসা অর্জন করে এবং তিনি তাদের প্রতি হাসেন এবং তাদের দেখে আনন্দিত হন। এক হল ঐ ব্যক্তি যে তার দল পরাজিত হবার পর ফেরত চলে যাওয়ার সময় একা শত্রুদের বিরুদ্ধে জান প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যায় অথবা আল্লাহ তাকে শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন। তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন, ‘তোমরা আমার বান্দার দিকে দেখ কিভাবে সে আমার জন্য অটল ও অবিচল রয়েছে’।”[২৭]

---

[২৪] ‘আল মুসনাদ’ (৬/২২, # ৩৯৪৯)। ইমাম আহমাদ শাকির কর্তৃক এটি তাহকীককৃত যেখানে তিনি বলেন, “এর সনদ সহীহ’। আল হায়সামী তাঁর ‘মুজমা’ আজ-জাওয়াইদ’ (২/২৫৫) গ্রন্থে বলেন, “আহমাদ এবং আবু ইয়ালা এটা বর্ণনা করেছেন যেমনটি আত-তাবারানী ‘আল কবীর’- এ বর্ণনা করেছেন। এর সনদ হাসান”। আবু দাউদ এটি সংক্ষেপিত আকারে বর্ণনা করেছেন(২/৩২৬)। আল-আলবানী তাঁর ‘মিশকাত আল মাসাবিহ’ (১২০৭) গ্রন্থে বলেন, “এটি হয় হাসান অথবা সহীহ।” একই রকমভাবে আস সানানির ‘সুবুল আস সালাম’(৪/১৩৪৮-১৩৪৯) দ্রষ্টব্য।

[২৫] মাশারি আল আশওয়াক্ব ইলা মাশারি আল উশাক্ব (১/৫৩২) দ্রষ্টব্য।

[২৬] ইবন আল মুবারাক এর ‘কিতাব আল জিহাদ’(১/৮৪) দ্রষ্টব্য; আল-আলবানী তাঁর ‘সহীহ আল-জামী’ (৩০৭৪) তে এটিকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন।

[২৭] আত তাবারানী কর্তৃক তাঁর ‘আল-কবীর’-এ বর্ণিত এবং আল-হায়সামি তার মুজমা’ আজ-জাওয়ায়ীদ (২/২৫৫) গ্রন্থে বলেন, “এর বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য।” আল আলবানী ‘আস সিলসিলাহ আস সাহিহাহ’(৩৪৭৮) গ্রন্থে একে সহীহ ঘোষণা করেছেন এবং ‘সহীহ আত তারগীব’(৬২৯) এ হাসান ঘোষণা করেছেন। শাইখ আবু কুতাইবাহ আশ শামি উল্লেখ করেন, “আফগানিস্তানের জালালাবাদ শহরের সন্নিকটে রণকৌশলগত কারণে যখন কিছু ভাই প্রচন্ড এক

অন্য আরেকটি বর্ণনায় নাবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"তিন প্রকার লোককে আল্লাহ ভালবাসেন .... এবং ঐ ব্যক্তি যে কোন মুজাহিদ দলে এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, অতঃপর তাঁর সাথীগণ পরাস্ত হয়, সে তার সিনা আগে বাড়িয়ে দেয় (অর্থাৎ প্রাণপণ যুদ্ধ শুরু করে দেয়) ।"[২৮]

এগারোঃ

আবু হুরাইরা (রদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, *"মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম হল ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্য ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রস্তুত থাকে । যখনই সে জিহাদের ময়দান থেকে আহবান শুনে, তখনই সে তার ঘোড়ার পিঠে চড়ে দ্রুতবেগে ছুটে যায় মৃত্যুর আশায় । এবং পরিশেষে আগ্রহের সাথে শহীদ হয়ে যায়... ।"*[২৯]

এ থেকে এটি সুস্পষ্ট হয় যে, নিহত হবার ইচ্ছা পোষণ করা এবং কায়মনোবাক্যে শাহাদাতের জন্য প্রার্থনা করা বৈধ তো বটেই, বরং অনেক বেশি প্রশংসার ব্যাপার ।

যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পিছু হটছিলেন এবং রাশিয়ানরা অনেক বেশি ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে ঐ জায়গায় ব্যাপক আক্রমণ পরিচালনা করেছিল, আমাদের ভাই শাকীক ইব্রহীম আল মাদানী রাশিয়ানদের ছিন্ন ভিন্ন করার জন্য একা রয়ে গেলেন । ব্যাপক বোমা বর্ষণের কারণে অন্যরা যখন পিছু হটছিল, তখন সে তার মৃত্যু পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে মর্টার দিয়ে হামলা চালিয়েছিল । আল্লাহ তাঁর উপর করুনা বর্ষণ করুন । একটি মিসাইল আসল এবং তার নিকটে বিস্ফোরিত হল । তার কোন চিহ্ন আর খুঁজে পাওয়া গেল না এবং কোন কবরই তার দেহ ধারণ করতে পারল না । সুতরাং আল্লাহ তার উপর সর্বোচ্চ দয়া প্রদর্শন করুন ।

[২৮] ইবনে আবি শায়বাহ কর্তৃক তাঁর 'মুসান্নাফ' (৫/২৮৯)- এ বর্ণিত এবং আত তিরমিযি এটিকে সহীহ বলেছেন (২৪৯১, ২৪৯২), আন-নাসাঈ(১৫৯৭, ২৫২৩) এবং "মুসনাদ" এ আহমাদ এবং অনুরুপভাবে "আল-কবীর" এ তাবারানী একে হাসান সনদ সহকারে এটি বর্ণনা করেছেন । আল হাকীম ও এটি বর্ণনা করেছেন এবং একে সহীহ মর্যাদা দান করেছেন । আল-আলবানী "মিশকাত আল মাসাবিহ" (১৮৬৪) তে উল্লেখ করেন যে, এর সনদ দুর্বল, কিন্তু এর অনুরুপ বর্ণনা শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য । অনুরুপ আরেক হাদীসে, নাবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, আল্লাহ তিন ধরনের মানুষকে ভালবাসেন এবং তিন ধরনের মানুষকে ঘৃণা করেন । সুতরাং একজন সাহাবী (রদিআল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করলেন, "তারা কোন তিন ধরনের লোক যাদের আল্লাহ ভালবাসেন?" রসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, "ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে ধৈর্য্য সহকারে কষ্টদায়ক হলেও (আল্লাহর দয়ার আকাঙ্খায়) শত্রুদের বিরুদ্ধে ঝটিকা আক্রমন করে এবং যুদ্ধ করতে করতে মারা যায় । এবং তোমরা তোমাদের সাথে এই লোকটিকে আল্লাহর কিতাবে লিপিবদ্ধ দেখবে । তিনি তখন এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের ভালবাসেন যারা সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে থাকে" (আস সফঃ৪) । আল আলবানী তাঁর সহীহ আত-তারগীব (২৫৬৯) গ্রন্থে একে সহীহ ঘোষণা করেছেন ।

[২৯] মুসলিম (১৮৮৯) । আল আলবানী কর্তৃক তাঁর 'সহীহ আত তারগীব'(১২২৬,২৭৩৬) এবং 'সহীহ আজ জামী'(৫৯১৫) তে এটি সহীহ ঘোষিত হয়েছে । পুরো হাদীসটি এভাবে শেষ হয়েছে, "এবং একজন মানুষ যে একটি পর্বত চূড়া অথবা একটি গভীর উপত্যকার তলদেশে সলাত প্রতিষ্ঠিত করে, যাকাত দেয় এবং তার রবের ইবাদাত করে, যতক্ষণ না মৃত্যু তাকে আলিঙ্গন করে । মানুষ তার থেকে ভাল ব্যতীত খারাপ দেখবে না" । এবং অন্য একটি বর্ণনায়, "মৃত্যু কামনায় রত অথবা নিহত হয় ......" । এবং আবু আত্তয়ানাহ তাঁর "মুসনাদে" বর্ণনা করেন, "মানুষের উপর একটি সময় আসবে, যখন তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা আল্লাহর পথে তাদের ঘোড়ার লাগাম ধারণ করবে । যখনই সে কোন ডাক (যুদ্ধের) শুনতে পায়, সে এর পিঠে চড়ে বসে এবং সে কায়মনোবাক্যে মৃত্যু কামনা করে ।" এবং অন্য একটি হাদীসে নাবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কি তোমাদের বলব না মর্যাদায় মানবজাতির মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ? সাহাবা (রদিআল্লাহু আনহু) বললেন "হ্যাঁ" । তখন তিনি বললেন, সেই লোক যে আল্লাহর পথে ঘোড়ার লাগাম ধারণ করে থাকে, যতক্ষণ না সে মারা যায় বা নিহত হয় ।" এবং আমরা আশা করি তাদের মধ্যে আমাদের সেই উনিশজন সিংহ ভাইয়েরা থাকবেন যারা তাদের ঘোড়াকে চালিত করেছিলেন হত্যা করার জন্য নতুবা নিহত হবার জন্য । আল্লাহ তাদের প্রিয়জনদের সাথে তাদের জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে স্থান দিন এবং তাদের প্রতি করুনা করুন ।

বারোঃ

আনাস (রদিআল্লাহু আনহু) হতে বর্নিত,

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবাগণ (মদীনা হতে) রওয়ানা হলেন এবং মক্কার মুশরিকদের পূর্বেই বদরপ্রান্তে পৌছে গেলেন। অতঃপর মুশরিকরাও উপস্থিত হল। রসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করলেন, "তোমাদের কেউ যেন আমি ব্যতীত কিছু না করে। অতঃপর কাফিরগন যখন কাছে এসে গেল, তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করলেন, "উঠ, এমন এক জান্নাতের জন্য যার প্রশস্ততা আসমানের সমান।" একথা শুনে উমাইর ইবনে হামাম বললেন, আসমান এবং জমিন পরিমাণ প্রশস্ত"? রসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন 'হ্যাঁ' তিনি বললেন, "বাহ! বাহ!" রসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তুমি বাহ বাহ কেন বললে"? তিনি বললেন, "না অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। বরং আমি ঐ জান্নাতের অধিকারী হওয়ার জন্যই একথা বলেছি। রসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তুমি ঐ জান্নাতের অধিবাসী।" সে তার ব্যাগ থেকে কিছু খেজুর বের করে খেতে লাগল, অতঃপর বলল, "যদি এই খেজুরগুলো খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করি, তবে সে তো দীর্ঘ সময়, অতঃপর সে খেজুরগুলো ছুড়ে মারল এবং তরবারী দিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল এবং শহীদ হয়ে গেল।"[৩০]

এই হাদীসে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, এই সাহাবী (রদিআল্লাহু আনহু) জান্নাতের কথা শোনার পর এবং এ বিষয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর তিনি এই বিশাল অর্জন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেন নি। কেননা, তিনি জান্নাতের লোকদের থেকে কোনক্রমেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে চাননি। তাই তিনি এই বাসনা নিয়েই একাকী যুদ্ধ করলেন যে, তিনি মারা যাবেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরোধিতা করেননি, বরং একে উৎসাহিত করেছেন যেখানে তিনি স্বয়ং ঘোষণা করেছেন,

"উঠ সেই জান্নাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাও যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিন পর্যন্ত।"[৩১]

[৩০] মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত (১৯০১) এবং আল-আলবানী কর্তৃক তাঁর "সহীহ আত তারগীব"(১৩১২)-এ সত্যায়নকৃত। আন নববি (রহীমাহুল্লাহ) তাঁর "শারহ" গ্রন্থে এই হাদীস সম্পর্কে বলেন, "এটি শাহাদাতের আকাঙ্খায় কুফ্‌ফারদের ভিতর নিজেকে নিবিষ্ট করা ও ঢুকিয়ে দেয়ার অনুমোদনের বিষয়টি ধারণ করে। এবং এটি এমন একটি ব্যাপার যা অনুমোদনযোগ্য এবং অধিকাংশ উলামার মতে এতে কোন ত্রুটি নেই। শরহে মুসলিম (১৩/৪৬)। শাইখ আবু কুতাইবাহ আল শামি উল্লেখ করেন, "আবু যর আত্ তুনিসি- আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন- আফগানিস্তানে নিহত হয়েছিলেন। তিনি আল্লাহর কিতাবের হাফিজ ছিলেন এবং আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত লাভের মানসে তাঁর শাহাদাতের উদগ্র বাসনা ছিল (একজন শহীদ হিসেবে)। একরাতে তিনি কুরআন পড়ছিলেন, ধৈর্য্য ধরে রাখতে না পেরে তিনি যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন- সুতরাং তিনি একাকীই আল্লাহর কম্যুনিস্ট শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলেন এবং তিনি মারা যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

[৩১] এবং অনুরুপ একটি বর্ণনায়, জনৈক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রসূল! আমি কোথায় থাকব যদি আমি মারা যাই?" তিনি সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, "জান্নাতে"। সুতরাং লোকটি তার হাতের খেজুরগুলি ফেলে দিলেন এবং মৃত্যু বরণ করার পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ করলেন। দ্রষ্টব্য নাইল আল আওতার' (৭/২১২)

তেরোঃ

আনাস বিন মালিক (রদিআলাহু আনহু) হতে বর্নিত, তিনি বলেন যে,

"আমার চাচা আনাস বিন আন-নাদর বদর যুদ্ধে অনুপস্তিত ছিলেন। সে জন্য তিনি রসূল সালাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম কে বললেন, "হে আল্লাহর রসূল! ইসলামের প্রথম যুদ্ধ যা আপনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করছেন তা থেকে অনুপস্থিত রয়েছি। আলাহ যদি আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ দেন, তাহলে আল্লাহ দেখবেন যে, আমি কী করি। যখন উহুদের দিন ঘনিয়ে এল, মুসলিমরা শক্রুদের মুখোমুখি হল, তখন তিনি বললেন, "হে আল্লাহ! এই লোকেরা যা করেছে তা থেকে আমি আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি (তাঁর সাথীদের বুঝিয়েছেন) এবং এই লোকেরা যা করেছে তা থেকে আমি নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি। এরপর তিনি এগিয়ে গেলেন এবং সাদ বিন মুয়ায (রদিআলাহু আনহু) এর সঙ্গে তাঁর দেখা হল, তখন তিনি বললেন, "হে সাদ ইবনে মুয়ায! নাদরের রবের শপথ করে বলছি, জান্নাত ...উহুদ পর্বতের পিছনে, আমি এর ঘ্রাণ পাচ্ছি।" সাদ পরে বললেন, "আমি তাঁর মত করতে সক্ষম নই (যেভাবে তিনি লড়াই করেছেন), হে আল্লাহের রসূল সালাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম।" আনাস (রদিআলাহু আনহু) বললেন, "সুতরাং আমরা তাঁকে প্রায় আশিটি তরবারির বর্শা ও তীরের আঘাতে জর্জরিত দেখতে পেলাম এবং আরও দেখতে পেলাম যে, মুশরিকরা কিভাবে তাকে হত্যা করেছে এবং তার দেহ ক্ষতবিক্ষত করেছেঃ তার বোন ছাড়া কেউই তাকে চিনতে করতে পারছিল না। সে (তার বোন) তাকে তার আঙ্গুল দ্বারা চিনতে পেরেছিল। সুতরাং আনাস (রদিআলাহু আনহু) বললেন, "আমরা চিন্তা করেছিলাম যে এই আয়াতটি তাঁর বা তাঁর মত যাঁরা তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে,

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾

"মু'মিনদের কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ অপেক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের সংকল্পে কোন পরিবর্তন করেনি।"[৩২]

[৩২] সূরা আল আহযাবঃ ২৩। এই হাদীসটি বুখারী (২৮০৫) এবং মুসলিম (১৯০৩) কর্তৃক বর্ণিত। আল-আলবানী তাঁর "সহীহ আত তারগীব" (১৩৫৮)- এ এটিকে সহীহ ঘোষণা দিয়েছেন। ইবনে হাজার (রহীমাহুল্লাহ) তাঁর "শারহ"- এ এই সম্পর্কে বলেন, " *আনাস বিন নাদর* এর ঘটনা থেকে অর্জিত কল্যাণের ভিত্তিতে জিহাদে একজনের নিজেকে উৎসর্গ করার বিষয়টি অনুমোদনযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে- এই অঙ্গীকার পূরণের বিষয়টি যদি আত্মার জন্য কষ্টদায়কও হয় এবং এটি যদি মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে ঃ তবুও একজনের নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করার ব্যাপারটি জিহাদে শাহাদাতের আকাঙ্খার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এবং এই হাদীসটি*আনাস বিন নাদর* (রদিআলাহু আনহু) এর মহৎ গুণকেই প্রতীয়মান করে এবং তাঁর নির্ভেজাল ঈমান, সত্যিকার তাকওয়া এবং প্রকৃত তাওয়াক্কুলের পরিচয় বহন করে। ফাত্হুল বারি দ্রষ্টব্য (৬/২৬-২৯)। ইমাম ইবন আল কইয়্যিম বলেন, "উহুদ যুদ্ধে প্রাপ্ত কল্যাণ থেকে একাকী শত্রুর মাঝে ঢুকে পড়ার বিষয়টি, যেমন *আনাস বিন নাদর* (রদিআলাহু আনহু) এবং অন্যদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল, বৈধ ও অনুমোদনযোগ্য হয়।" দ্রষ্টব্যঃ 'যাদ আল মাআদ' (৩/২১১)

চৌদ্দঃ

মুজাহিদ (রহীমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত আছে যে, *"নাবী সালাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং খাব্বাব (রদিআলাহু আনহু) কে এক অভিযানে সেনাদল হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন এবং দিহীয়াহ (রদিআলাহু আনহু) কে একাই আরেক অভিযানে পাঠিয়েছিলেন ।"*[৩৩]

এই বিষয়টিতে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, জিহাদে অপারেশনের ঝুঁকি যে মাত্রায়ই থাকুক না কেন, ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও তা বৈধ ও অনুমোদন যোগ্য এবং ঝুঁকির মাত্রা যত বেশি হবে, তাতে পুরুষ্কারও তত বেশি হবে ।

অনুরুপভাবে, আরেকটি বর্ণনায় রসূলুলাহ সালাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম আমর ইবনে উমাইয়াহ (রদিআলাহু আনহু) এবং আনসারদের মধ্য হতে একজনকে একটি ব্রিগেড হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আনিস (রদিআলাহু আনহু) কে স্বয়ং একটি ব্রিগেড হিসেবে প্রেরণ করে ছিলেন ।[৩৪]

পনেরঃ

বায়হাকী বর্ণনা করেন, আশ শাফিয়ী (রহীমাহুল্লাহ) বলেন যে, *"বীরে মাওনা কূপের কাছাকাছি জায়গায় সকল সাহাবীর মৃত্যুর ঘটনার বিপর্যয়ের পর কেবল একজন সাহাবী (রদিআলাহু আনহু) পিছনে ছিলেন । তিনি পৌঁছে দেখলেন যে, শকুনেরা তাঁর সাথীদের খাচ্ছিল । তখন তিনি আমর ইবনে উমাইয়াহকে (রদিআলাহু আনহু) বললেন, "আমি এই শত্রুদের মাঝে সরাসরি এগিয়ে যাচ্ছি যাতে তারা আমাকে মারতে পারে । আমি আমার সঙ্গীদের শাহাদাতের স্থান হতে পিছনে থাকতে পারি না । তিনি যেমনটি বললেন তেমনটিই করলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন । পরে আমর ইবনে উমাইয়া মদীনায় ফিরে এসে রসূলুলাহ সালাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম কে উক্ত ঘটনা জানালেন । রসুলুলাহ সালাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম তাঁর প্রশংসা করলেন এবং রসূল সালাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম আমরকে বললেন, "এবং তুমি কেন তার সাথে অগ্রসর হলে না?"*[৩৫]

এই হাদীসে দেখা যায়, শাহাদাহ বরণ করে নেবার মানসেই অগ্রসর হওয়ার বিষয়টিতে রসূল সালাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম কোন আপত্তি করেননি, বরং যে তা না করে ফিরে এসেছিল, তাকেই তা করার জন্য বলেছিলেন এবং তার সঙ্গীর মত তাকেও শহীদ হতে উদ্ধুদ্ধ করেছিলেন ।

---

[৩৩] আল বায়হাকী সহীহ সনদে তাঁর "আস সূনান আল-কুবরা"(৯/১০০) তে বর্ণনা করেন ।

[৩৪] প্রাগুক্ত (পূর্বের রেফারেন্স দ্রষ্টব্য)

[৩৫] 'আস সুনাম আল কুবরা'; আল বাইহাকী (৯/১০০)

ষোলঃ

আনাস ইবনে মালিক (রদিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত,

"রসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ যুদ্ধের সময় সাতজন আনসার এবং দুইজন কুরাইশসহ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। যখন কাফিররা রসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম কে ঘিরে ফেলল, তখন তিনি বললেন যে, 'কে আছ? যে এদেরকে আমার কাছ থেকে প্রতিহত করবে, তার জন্য জান্নাত' অথবা বললেন যে, 'সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। তখন একজন আনসার অগ্রসর হলেন এবং শত্রুদের বিরূদ্ধে লড়াই করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন। অতঃপর শত্রুরা আবারও তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘিরে ফেলল। তখনও রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'কে আছ? যে আমাকে এদেরকে আমার হতে প্রতিহত করবে?' তখন আবারও একজন আনসারী এগিয়ে এলেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। এভাবে সাতজনই একে একে শহীদ হয়ে গেলেন। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমরা আমাদের সাথীদের সাথে ইনসাফ করি নাই।' (অর্থাৎ আমরাও যদি শহীদ হয়ে যেতাম, তাহলেই কেবল তাদের সাথে ইনসাফ করা হত।)"[৩৬]

সতেরোঃ

ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে ইবনে কাসীর (রহীমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেন যে, *"আবু দুজানাহ্ (রদিআল্লাহু আনহু) নিজেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর মানবঢাল হিসেবে এমনভাবে তৈরি করেছিলেন যে, তীর তাঁর পিঠে বিধঁত, এগুলি তাকে কষ্টে জর্জরিত করত, এমনকি যতক্ষণ অনেক তীর তাঁকে বিদ্ধ করে ততক্ষণ পর্যন্ত।"*[৩৭]

সুতরাং এই হাদীস থেকে আমরা দেখি যে, অধিনায়কের নিরাপত্তার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা অনুমোদনযোগ্য- এটি এমন একটি বিষয় যা কেবল নাবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর বেলায়ই প্রযোজ্য নয়, সকল আমিরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুতরাং আমীরের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা যদি অনুমোদনযোগ্য হয়ে থাকে, তাহলে সম্পূর্ণ দ্বীনের ক্ষেত্রে কি তা অনুমোদনযোগ্য হবেনা ?

---

[৩৬] সহীহ মুসলিম (১৭৮৯)। যেমনটি নাবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমরা আমাদের সাথীর সাথে যথাযথ আচরণ করিনি"- ইমাম আন নববী ব্যাখ্যা করেন, "এর অর্থ হল, কুরাইশরা আনসারদের প্রতি সুবিচার করেনি, কেননা, দুইজন কুরাইশ যুদ্ধ করার জন্য বেরিয়ে আসেননি, বরং এটি আনসাররাই ছিলেন যাঁরা একে একে বের হয়ে এসেছিলেন (এবং তাদের প্রত্যেকেই মৃত্যু বরণ করেছিলেন)।

[৩৭] আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (৪/৩৪)

আঠারোঃ

ইয়াজিদ ইবনে আবি উবায়দা (রদিআলাহু আনহু) থেকে দুটি সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে । তিনি বলেন,

"আমি সালামাহ ইবনে আল-আকওয়া (রদিআলাহু আনহু) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনি হুদায়বিয়ার দিন আলাহর রসূলের কাছে কিসের উপর বাইয়াত দিয়েছিলেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'মৃত্যুর উপর' ।"[৩৮]

উনিশঃ

চৌদ্দজনেরও বেশি হতে মুহাম্মাদ ইবনে সাবিত ইবনে কায়েস ইবনে শিমাস হতে বর্ণনা করেছেন, ইয়ামামার যুদ্ধে যখন মুসলিমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, তখন আবু হুযায়ফার মুক্ত দাস সালিম (রদিআলাহু আনহু) বললেন,

"আমরা এভাবে রসূলুলাহ সালালাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম এর সঙ্গে আচরণ করিনি । তখন তিনি তার জন্য একটি পরিখা খনন করলেন এবং মুহাজিরিনদের পতাকা বহন করে এর মধ্যে দাঁড়ালেন এবং ইয়ামামার দিনে শহীদ হওয়ার আগ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন ।"

এটি এবং পরবর্তী বর্ণনাটি এটিই নির্দেশ করে যে, এমন অনমনীয়তাই কাঙ্খিত, যদিও তা নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে । সালিম (রদিআলাহু আনহু) এরূপ কাজকে রসূলুলাহ সালালাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম এর সময়ের কর্ম-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে একীভূত করেছেন ।

একবার মুসা ইবনে আনাস ইয়ামামার যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, *"আনাস বিন মালিক (রদিআলাহু আনহু) সাবিত বিন কায়েস (রদিআলাহু আনহু) এর নিকট গেলেন । তিনি [সাবিত (রদিআলাহু আনহু)] তার উরুর কাপড় উঠিয়ে শরীরে 'হানূত'*[৩৯] *লাগাচ্ছিলেন । আনাস (রদিআলাহু আনহু) জিজ্ঞেস করলেন,*

'চাচা! কোন জিনিসটি আপনাকে যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে রাখল?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমার ভাতিজা! আমি এখনই আসছি এবং নিজের শরীরে '<u>হানূত</u>' সুগন্ধি দিতে লাগলেন, এরপর তিনি আসলেন এবং বসলেন ।' আনাস তখন উল্লেখ করলেন যে, 'যুদ্ধক্ষেত্র থেকে লোকেরা পালিয়ে গেছে ।' তাতে সাবিত (রদিআলাহু আনহু) বললেন, 'শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার রাস্তাটা এখন আমার জন্য পরিষ্কার হয়ে গেল । আমরা এভাবে রসূলুলাহ সালালাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম এর সঙ্গে আচরণ করিনি (আমরা কখনোই যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করিনি) । তোমরা তোমাদের শত্রুর নিকট থেকে কত খারাপ স্বভাব অর্জন করেছ'!"[৪০]

---

[৩৮] ফাত্হুল বারি (৬/১১৭), আল বুখারী (৪১৬৯, ৭২০৬) এবং মুসলিম (১৮৬০)

[৩৯] 'হানুত' এক ধরনের সুবাস এবং সুগন্ধি যা মেশ্ক, আম্বর, কস্তুরি থেকে প্রস্তুত করা হয় । এটি কাফনের মৃতের দেহে দেয়া হয়, যাতে দীর্ঘ সময় ধরে দুর্গন্ধ বের না হয় ।

[৪০] আল বুখারী (২৮৪৫) । ইবনে আল মুবারক, আল বাইহাকী, ইবনে সাদ, আত্-তাবারি এবং আল-হাকিম কর্তৃক বর্ণিত ।

ইবনে হাজার (রহীমাহুল্লাহ) আরও যোগ করেন যে,

“সাবিত ইবনে কায়স ইবনে শিমাস ইয়ামামার দিনে গায়ে ‘হানূত’ দিয়ে সমাধিস্থ হওয়ার জন্য দুই টুকরা সাদা কাপড় পরিধান করে এসেছিলেন। লোকেরা যখন পরাজিত হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন, ‘আয় আল্লাহ! এই মুশরিকদের আমল হতে আমি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করছি এবং এরা যা করেছে তা থেকে আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি (তার সহযোদ্ধাদের উদ্দেশ্য করে)। তোমরা আজ তোমাদের শত্রুর নিকট থেকে কত খারাপ স্বভাব অর্জন করেছ! সুতরাং আমাদের এবং তাদের পথকে আপনি আলাদা করে দিন।’এরপর তিনি শত্রু ব্যূহ ভেদ করে ঢুকে পড়লেন এবং মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত লড়াই করে গেলেন..... ।”

এই ঘটনাটি জিহাদের ময়দানে প্রয়োজনে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের অনুমোদনের ব্যাপারটি প্রমাণ করে। মৃত্যুর পূর্ব প্রস্তুতিস্বরূপ হানূত এবং কাফনের কাপড় পড়ে যুদ্ধের ময়দানে হাজির হওয়াতে বিষয়টির অনুমোদন প্রমাণিত হয়। এটি সাবিত ইবনে কায়েস এর দৃঢ়তা, নিয়্যত এবং ঐকান্তিকতা ও বিশুদ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায় । এই ঘটনাটি সব কিছু পরিত্যাগ করে যুদ্ধের দিকে আমাদের আহ্বান জানায় ও উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদের তিরস্কার করে, যারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়। এতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়ে সাহাবারা যুদ্ধক্ষেত্রে কতটা সাহসী এবং দৃঢ় থাকতেন।[৪১]

ইবনে আন-নুহাস (রহীমাহুল্লাহ) মত প্রকাশ করেন, *“‘হানূত’ হল একটি উত্তম সুগন্ধি বিশেষ, যা বিশেষভাবে মৃতকে দেয়া হয়। এটি দেয়া হয় সুগন্ধের জন্য। তাদের (যারা যুদ্ধরত ছিলেন) সুগন্ধি দেবার একমাত্র কারণ ছিল- যদিও আল্লাহ এ সম্পর্কে ভাল জানেন- মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ এবং শাহাদাত লাভের চরম বাসনা।”*[৪২]

বিশঃ

ইবনে জাবির আত তাবারি বর্ণনা করেন যে,

“মূতার যুদ্ধে জাফর বিন আবি তালিব (রদিআল্লাহু আনহু) পতাকা নিলেন এবং তিনি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যুদ্ধ করলেন। যখন তিনি তার হালকা রং এর ঘোড়ার দিকে ফিরলেন, তখন সেটাকে আঘাত করলেন (যাতে তিনি পালাতে না

[৪১] ফাত্হুল বারি (৬/৫২)। নাবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রসঙ্গে বলেন, “সাবিত ইবনে কায়েস ইবনে শিমাস কী চমৎকার একজন মানুষ! ইমাম আন নববি কর্তৃক তাঁর “সাবিত আল আসমা” (২/৯৯)য় বর্ণিত এবং আলবানী কর্তৃক তাঁর “সহীহ আল জামী”(৬৭৭০) তে সহীহ হিসেবে আখ্যায়িত।

[৪২] ‘ মাশারি আল আশওয়াক্ব ইলা মাশারি আল উশাক্ব (১/৬৭৩)

পারেন)। এরপর তিনি মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ করে গেলেন। সুতরাং, মুসলিমদের মধ্যে জাফরই (রদিআলাহু আনহু) প্রথম যিনি তার ঘোড়াকে এভাবে আঘাত করেছিলেন।"[৪৩]

একুশঃ

আবু বকর ইবনে আবি মুসা বর্ণনা করেন,

"শত্রুদের মাঝে (যুদ্ধ ক্ষেত্রে) থাকা অবস্থায় আমি আমার বাবার কণ্ঠ শুনতে পেলাম, তিনি বললেন, রসূলুলাহ সালালাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম বলেছেন, 'নিশ্চিতভাবে তলোয়ারের ছায়াতলেই জান্নাত'। এক দরিদ্র ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, 'হে আবু মুসা! তুমি কি এটি রসূলুলাহ সালালাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম এর থেকে শুনেছো?' আমার বাবা বললেন, 'হ্যাঁ'। লোকটি পিছনে তার সাথীদের নিকট গেলেন এবং তাদের বললেন, 'আমি তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' তিনি তখন তার তরবারির খাপটি ভেঙ্গে ফেললেন এবং সেটি দূরে নিক্ষেপ করলেন এবং শত্রুদের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তরবারী দিয়ে তাদের প্রতিরোধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।"[৪৪]

ইবনে আব্বাস (রদিআলাহু আনহু) এর মুক্ত দাস ইকরিমাহ এর সূত্রে বর্ণিত,

"আমর ইবনে আল জামুহ নামক জনৈক প্রবীণ আনসার ব্যক্তির পা খোঁড়া ছিল। তাই নাবী সালালাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম যখন বদরে গেলেন, আমর তার ছেলেদের বললেন, 'তোমরা আমাকে বাইরে নিয়ে যাও।' তার অক্ষম অবস্থা নাবী সালালাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম কে উল্লেখ করা হল এবং তিনি তাকে (আমর রদিআল্লাহু আনহু কে) যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি দিলেন। অতঃপর যখন উহুদের দিন আসল এবং নাবী সালালাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম বেরিয়ে গেলেন (যুদ্ধে), তিনি তার পুত্রদের বললেন, 'তোমরা আমাকে বাইরে নিয়ে যাও।' তারা উত্তর দিল, 'রসূলুলাহ সালালাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম আপনাকে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।' তিনি বলেন, 'তোমরা আমার কাছ থেকে দূর হও! তোমরা আমাকে বদরের জান্নাত থেকে নিষেধ করেছ, এখন তোমরা এর থেকে (উহুদ) নিষেধ করছ।' সুতরাং তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং লোকেরা যখন যুদ্ধের জন্য রসূলুল্লাহ সালালাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম এর সঙ্গে দেখা করল, তিনি তখন রসূলুল্লাহ সালালাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম কে জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ যদি আমি মারা যাই-আমি কি আমার খোঁড়া পা সত্ত্বেও জান্নাতে যেতে পারব?' নাবী সালালাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম উত্তর দিলেন 'হ্যাঁ'। সুতরাং আমর উত্তর দিলেন, 'তাহলে যিনি আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর নামে শপথ করে আমি বলছি, যদি আল্লাহ অনুমতি দেন, 'নিশ্চিত আমি আজ খোঁড়াতে খোঁড়াতে জান্নাতে যাব।' তিনি তখন তার সাথে

---

[৪৩] আত তাবারির "আত তারিখ" (২/১৫১)

[৪৪] মুসলিম (১৯০২)। আল-আলবানীর "সহীহ আত তারগীব"- এ সহীহ হিসেবে বর্ণিত। নাবী সালালাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম এর মূল বক্তব্যটি আল-বুখারীতে (২৮১৮, ২৯৬৫, ৩০২৪) এবং মুসলিমে (১৭৪২) বর্ণিত। আরও দ্রষ্টব্যঃ ইবনে হাজাম এর "আল-মুহাল্লা" (৭/২৮৪), ইবনে আল কায়্যিম এর যাদ আল মাআ'দ (৩/৭৯) এবং আল আলবানীর "সহীহ আল জামী"(১৫৩০, ২৭৫০, ৩১১৭)

থাকা সালিম নামক কিশোর দাসকে বললেন, 'যাও তুমি তোমার পরিবারে চলে যাও (তুমি মুক্ত) ।' তখন ছেলেটি বলল, 'আপনার কী হয়েছে? আপনি কি আমাকে আপনার সঙ্গে কল্যাণের জন্য (শাহাদাত) এগিয়ে যেতে দেবেন না?; লোকটি তখন বলল, 'তাহলে সামনে এগিয়ে যাও ।'অত:পর দাস বালকটি সামনে এগিয়ে গেল এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেল । আমর (রদিআলাহু আনহু) তখন সামনে এগিয়ে গেলেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন ।"[৪৫]

আরও বর্ণিত আছে যে,

"আমর ইবনে আল-জামুহ বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি জান্নাতে না যাওয়া পর্যন্ত আমার পরিবারের নিকট ফিরে যাব না ।' উমার ইবনে আল-খাত্তাব তাঁকে বললেন, 'হে আমর! কোন কিছু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উপর জোর করো না ।' রসূলুলাহ সালালাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম বললেন, 'হে উমার, শান্ত হও! কেননা, নিশ্চিতভাবে আল্লাহর নামে যারা শপথ করে আল্লাহ তা পূর্ণ করেন । আমর ইবনে আল জামুহ তাদের অর্ন্তভুক্ত যে তার খোঁড়া পা নিয়েই জান্নাতে ছুটে যাবে' ।"[৪৬]

অন্য একটি বর্ণনায়,

"আমর ইবনে আল জামুহ নাবী সালালাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম এর নিকট আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি যদি মৃত্যু বরণ না করা পর্যন্ত আলাহর রাস্তায় যুদ্ধ করি, আমি কি সুস্থ পা নিয়ে জান্নাতে হাটতে পারব?' তিনি এটি জিজ্ঞেস করলেন, কেননা তাঁর একটি পায়ে অক্ষমতা ছিল । নাবী সালালাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম উত্তর দিলেন 'হ্যাঁ' । অতঃপর আমর, তার ভাতিজা এবং তাঁর মুক্ত গোলাম উহুদের দিন মারা গেল । রসূলুলাহ সালালাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম যখন তাঁকে অতিক্রম করছিলেন তখন বললেন, 'আমি যেন তোমাকে সুস্থ পা নিয়ে জান্নাতে হেঁটে যেতে দেখছি ।' নাবী সালালাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম তখন তাদের তিনজনকে একত্রে কবর দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন ।"[৪৭]

বাইশঃ

ইবনে আসাকির এবং ইবনে কাসির কর্তৃক বর্ণিত যে,

---

[৪৫] ইবনে আল মুবারক, আল বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত এবং আল ওয়াকিদির "আল মাগাজী" তে উল্লিখিত ।

[৪৬] আলবানীর "সহীহ আল- মাওয়ারিদ"(১৯২৮)এ তিনি এটিকে হাসান ঘোষণা করেছেন । সা'দ ইবনে আল মুসায়্যিব (রদিআলাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, উহুদের দিনের আগের দিনেও আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রদিআলাহু আনহু) বলেন, "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার কসম করে বলছি, আমি আগামীকাল শত্রুকে মুকাবিলা করব এবং তারা আমাকে মারবে এবং তারা আমার পেট কেটে ছিন্ন ভিন্ন করবে এবং তারা আমার নাক, কান কাটবে এবং তখন আপনি জিজ্ঞেস করবেন, "কিসের জন্য" এবং আমি উত্তর দিব, "আপনার জন্য (ও আমার রব)" । সুতরাং সে পরদিন শত্রুদের মোকাবেলা করল এবং সেরকম তার প্রতি করা হয়েছিল । ইবনে আল মুবারক কর্তৃক তাঁর "কিতাব আল জিহাদ" এবং আল হাকিম এবং আত্ তাহাবী কর্তৃক সম্মতি প্রদানকৃত এবং আবু নূয়ায়ম এর "আল-হিলিয়াহ' এবং আব্দুর রাজ্জাক এর 'মুসান্নাফ' এবং আল ওয়াকিদির "আল মাগাজি" এবং ইবনে হাজার এর "আল ইসবাহ" কর্তৃক বর্ণিত । দ্রষ্টব্যঃ আল আলবানীর "ফিক্হ আস সিরাহ"(২৬২),

[৪৭] আল আলবানীর 'আহকাম আল জানাইজ'(১৮৫) এ বর্ণিত এবং এটিকে তিনি হাসান বলেছেন ।

"ইয়ারমূকের দিনে যে মুসলিম প্রথম শহীদ হয়েছিলেন তিনি ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি আবু উবাইদাহ ইবন আল জার্‌রাহর (রদিআলাহু আনহু) নিকট আসলেন এবং বললেন, 'আমি তাদের বিরুদ্ধে আমার সর্বশক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি (যতক্ষণ না তারা আমাকে মেরে ফেলে), আপনি কি আমার জন্য আপনার নাবী সালালাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম এর নিকট কোন বার্তা পৌঁছাবেন?' আবু উবাইদাহ (রদিআলাহু আনহু) উত্তর দিলেন, 'তাঁকে আমার সালাম পৌঁছাও এবং জানাও যে, আমরা নিশ্চিতভাবে সত্য অবলোকন করেছি যার ওয়াদা আমাদের রব আমাদের করেছেন।' অত:পর লোকটি এগিয়ে গেল (এবং যুদ্ধ করল) এবং শহীদ হয়ে গেল। আল্লাহ তাঁর উপর সদয় হোন।"[৪৮]

সুতরাং এই হাদীসগুলি থেকে এ বিষয়টি প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহর বাণীকে বিজয়ী করার জন্য, দ্বীনের কল্যাণের খাতিরে যদি এমন কাজ করা হয় যা সরাসরি মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে তা এমনই বিষয়, যা সাহাবা (রদিআলাহু আনহু) এবং তাবিঈনদের মাঝে ব্যাপকভাবে পরিচিত, প্রচলিত এবং প্রশংসিত ছিল।[৪৯]

[৪৮] ইবনে আসাকির এর "তারিখ দিমাশক"(৬৭/১০১) এবং ইবনে কাসির এর "আল বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ"(৭/১১)

[৪৯] আরবী আসল গবেষণায় ৪০টির বর্ণনা আছে, কিন্তু সংক্ষিপ্ততার জন্য আমরা বাকীগুলির উল্লেখ করিনি।

<u>এককভাবে শত্রুকে আক্রমনের বিষয়ে আলিমগণের রায়ঃ</u>

নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও শত্রুর উপর এককভাবে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং আক্রমণ করার ক্ষেত্রে শারীয়াহর অনুমোদনের বিষয়ে আমরা এই বিষয়টিই উপস্থাপন করতে চেয়েছি যে, ফিদায়ী অপারেশন এই মূলনীতির বোধ থেকেই উৎসারিত। ঈমানের দুর্বলতা কিংবা ঈমানের অভাবের সঙ্গে আত্মহত্যার বিষয়টি জড়িত। যাহোক, বর্তমান কালের ফিদায়ী অপারেশনের বিষয়ে 'সালাফ'-দের ধারণা ছিল না। এর কারণ হল এগুলি আজ উৎসারিত হয়েছে যুদ্ধ-বিগ্রহের কৌশলগত পরিবর্তনের কারণে এবং তারা এগুলিকে সুনির্দিষ্ট করে পরিচিত করে যাননি। তারা অনুরুপ ইস্যুগুলি পরিচিত করেছেন, যেমন একহাতেই শত্রুকে আক্রমন করা এবং তাদের মধ্যে এই ত্রাস সঞ্চার করা যে, আমরা মৃত্যুকে পরোয়া করি না। তারা সাধারণ নীতিমালা আলোচনা করেছেন যার মধ্যে ফিদায়ী অপারেশন অর্ন্তভুক্ত এবং তা করতে গিয়ে তারা সেসব দলীলের উপর নির্ভর করেছেন, যে দলীলগুলি আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। বর্তমান ফিদায়ী অপারেশন এবং পূর্বের ক্ল্যাসিকাল দৃষ্টান্ত সমূহের মাঝে একটি পার্থক্য রয়েছে, আমাদের ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিটি নিজ হাতে মারা যায়, যেখানে পূর্বে সে শত্রুর হাতে মারা যেত। আমরা এটাও ব্যাখ্যা করব যে, এই পার্থক্যটি রায়ের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব রাখে না।

সাহাবা এবং তাবিয়্যিন আলিমগণঃ

প্রথমতঃ ইবনে আল মুবারক এবং ইবনে আবি শায়বাহ হতে বর্ণিত, মুদরিক ইবনে আউফ আল-আহমায বলেন,

"আমি উমারের সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম যখন নুমান ইবনে মুকরিম এর দূত তার কাছে আসল এবং উমার (রদিআল্লাহু আনহু) তাঁকে লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি জবাব দিলেন, 'অমুক অমুক এবং অমুক অমুককে আহত করা হয়েছে এবং অন্যরা এবং অন্যদের যাদের আমি চিনি না।' উমার (রদিআল্লাহু আনহু) বললেন, 'কিন্তু আল্লাহ তাদের চিনেন।' (দূতটি) বলল, 'আমির উল মু'মিনিন! (সেখানে একটি লোক ছিল) একজন তার জীবন বিক্রি করে দিয়েছেন।' এতে মুদরিক বলল, 'তিনি আমার মামা, আল্লাহর কসম, আমির উল মুমিনিন! লোকরা দাবী করছে সে নিজেকে ধ্বংসের মাঝে নিক্ষেপ করেছে।' উমার বললেন, 'তারা মিথ্যা বলেছে (তারা ভুল বলেছে)। বরং তিনি তো তাদের অর্ন্তভুক্ত যারা এই পৃথিবীর বদলে আখিরাতকে কিনে নিয়েছেন'।" আল-বায়হাকী উল্লেখ করেছেন যে সেটি ছিল নাহাওয়ান্দ এর দিন।"[৫০]

দ্বিতীয়তঃ ইবনে আবি শাইবাহ বর্ণনা করেন যে,

[৫০] ইবনে আবি শায়বাহ এর "মুসান্নাফ"(৫/৩০৩), ইবনে হাজার এর ফাতহুল বারী (৮/৩৩-৩৪), ইবনে জারীর কর্তৃকও অনুরুপ বর্ণিত হয়েছে।

"কুফ্‌ফারদের একটি সেনাদল সম্মুখে অগ্রসর হল এবং আনসারদের মধ্যে একটি লোক তাদের মুখোমুখি হয়ে আক্রমন করলেন এবং তাদের ব্যুহ ভেঙ্গে ফেললেন, তারপর ফিরে আসলেন, এরুপে দুই-তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। সাদ ইবনে হিশাম এটি আবু হুরায়রাহ (রদিআলাহু আনহু) -কে উল্লেখ করলেন, যার ওপর তিনি এই আয়াতটি আবৃতি করলেন,

﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

"মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আত্ম বিক্রয় করে থাকে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।"[৫১]

তৃতীয়তঃ আল হাকিম এবং ইবনে আমি হাতিম ইবনে আসাকিরের অনুরুপ বর্ণনার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে,

আল বারা'কে এই আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং নিজেদের হাতে নিজেদের ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।"[৫২]

এটি কি সেই ব্যক্তিকে বুঝায় যে, যে মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত শত্রুকে মোকাবেলা করে । এবং অন্য একটি বর্ণনায়,

"যে ব্যক্তি ১০০০ জন শত্রু সৈন্যের ব্যূহে ঢুকে যায় এবং সে কেবল তার হাতে একটি তলোয়ার নিয়ে যায়?" তিনি বললেন, "না, বরং এটি সেই লোক যে একটি পাপ কাজ করে এবং পরে বলে যে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না।"[৫৩]

চতুর্থত ঃ বর্ণিত আছে যে, তাবিয়ীনদের জনৈক বিখ্যাত ইমাম আল কাসিম ইবনে মুখাইমারাহ এই আয়াতটি,

"তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং নিজেদের হাতে নিজেদের ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না"[৫৪] এ সম্পর্কে বলেন, **"ধ্বংস হল তা-ই যাতে আল্লাহর পথে (জিহাদ) ব্যয় করাকে পরিত্যাগ করা হয়। যে কারণে কেউ যদি ১০০০০ সৈন্যের মধ্যে ঢুকে পড়ে, তখন এরুপ করার ক্ষেত্রে কোন আপত্তি নেই।"**[৫৫]

---

[৫১] সূরা আল-বাকারাহঃ ১৯৫

[৫২] মুসান্নাফ (৫/৩২২)

[৫৩] আল হাকিম এর "আল-মুসতাদারাক" (২/২৭৫) এবং ইবনে আবি হাতিম এর তাফসির (১/১২৮) দ্রষ্টব্য। আত তাবারি কর্তৃক এই আয়াতটির ব্যাখ্যা তাঁর তাফসীরে (৩/৫৮৪) হুযাইফাহ (রদিআলাহু আনহু), ইবনে আব্বাস (রদিআলাহু আনহু), ইকরিমাহকে হাসান আল বাসরি, আতা, সাইদ ইবনে জুবায়র, যাহ্হাক, আস সূদ্দী, মুজাহিদ, এবং অন্যদের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। আশ শায়বানি কর্তৃক তাঁর "আস-সিয়ার আল কবীর" ও দ্রষ্টব্য। ইবনে আবি শায়বাহ বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (রহীমাহুল্লাহ) এই আয়াত সম্পর্কে বলেন, "যখন তুমি শত্রুকে মোকাবিলা কর, তখন তুমি তোমার বক্ষ প্রদর্শন কর (সাহসিকতার সাথে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর), কেননা নিঃসন্দেহে এই আয়াতটি ব্যয় সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে।" ইবনে আবি শায়বাহ'র মুসান্নাফ'(৫/৩৩১) দ্রষ্টব্য।

[৫৪] সূরা আল বাকারাহঃ ১৯৫

[৫৫] মাশারি আশওয়াক্ব (১/৫২৮)

বিখ্যাত তাফসীর আলিমগণের রায়ঃ

পঞ্চমতঃ ইবনে আল-আরাবী এই আয়াতটির ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন,

"তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং নিজেদের হাতে নিজেদের ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না ।"[৫৬]

এই "ধ্বংস" সংক্রান্ত ব্যাপারে পাঁচ ধরনের (এর অর্থ সম্পর্কে) মত রয়েছেঃ

১. আলাহর পথে ব্যয় করা ছেড়ে দিও না ।

২. কোন পাথেয় সম্বল ছাড়া বেরিয়ে যেও না ।

৩. জিহাদ পরিত্যাগ কর না ।

৪. শত্রুকে এই ধারণা দিও না যে, তোমাকে ঘায়েল করা সম্ভব ।

৫. ক্ষমার আশা পরিত্যাগ কর না ।

আত-তাবারী বলেন,

"এটি একটি সাধারণ বিষয় (অর্থাৎ সকল বিষয়ই এতে আওতাভুক্ত হবার সুযোগ রয়েছে) এবং এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই ।" শত্রুর ব্যুহে ঢুকে পড়ার বিষয়টি ব্যতীত তিনি যা বলেছেন তা যথার্থ বলেছেন,কেননা,আলিমগণের কেউই এই আয়াতের সঙ্গে এই বিষয়টিকে (শত্রু ব্যুহে ঢুকে পড়া) জড়িত করার বিষয়ে একমত পোষন করেননি । আমাদের আলিমগণের মধ্যে (মালিকি) আল কাসিম বলেন যে, অসাধারণ শক্তিধর সেনাদলের মধ্যে হাতে যা আছে তা নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ার বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই, যদি সে তার কাজে দৃঢ় থাকে এবং সম্পূর্ণ খালিসভাবে আল্লাহর জন্য তা করে । যদি তার কোন শক্তি না থাকে, তাহলে তা তখন আত্মাকে ধ্বংস করার শামিল । কেউ কেউ এটি বলেছেন যে, যদি তার শাহাদাতের প্রবল আকাঙ্খা থাকে এবং তার নিয়্যত যদি খালিস হয়, তাহলে সে আক্রমন করতে পারে, কেননা তার লক্ষ্য হল শত্রু দলের একজনকে হলেও হত্যা করা এবং এই আয়াতে তা পরিষ্কার,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾

"মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আত্মা বিক্রয় করে থাকে । আলাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র ।"[৫৭]

---

[৫৬] সূরা আল বাকারাহঃ ১৯৫

আমার দৃষ্টিতে এ ব্যাপারে সঠিক মতটি হল এই যে, একটি শত্রু সেনাদলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুমোদনের বিষয়টিকে কেউই অস্বীকার করতে পারে না, কেননা এর চারটি দিক রয়েছেঃ

১. শাহাদাতের অন্বেষা

২. শত্রুর ক্ষতিসাধন[৫৮]

৩. শত্রুকে আক্রমনে মুসলিমদের উদ্বুদ্ধ করা

৪. শত্রুকে নৈতিকভাবে পর্যুদস্ত করা, এভাবে যে, একজন যদি এরূপ করতে পারে, তাহলে সকলে সম্মিলিতভাবে কী অবস্থা করতে পারে!

ষষ্ঠতঃ আল কুরতুবী (রহীমাহুল্লাহ) বলেন,

আবু হানিফার ছাত্র মুহাম্মাদ ইবনে আল হাসান আশ-শায়বানি বলেন, "একজন লোক যদি একাকী ১০০০ জনের মুশরিকদলের ভিতর ঢুকে পড়ে, তাহলে তাতে কোন বাধা নেই যদি তাতে সাফল্যের আশা থাকে অথবা শত্রুপক্ষের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে; অন্যথায় এটি অপছন্দনীয়, কেননা, মুসলিমদের কোন সুবিধা আনয়ন ছাড়াই সে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হল। অন্যদিকে যার লক্ষ্য হল মুসলিমদের সাহসিকতা বাড়ানো ও অনুপ্রাণিত করা, তার ক্ষেত্রে এর অনুমোদনের বিষয়টি অমূলক নয়, কেননা, তাও মুসলিমদের জন্য এক ধরনের সুবিধা বয়ে আনে। যদি তার প্রত্যয় এই হয় যে, এর মাধ্যমে সে শত্রুকে ভীত করবে এবং মুসলিমদের ঈমানকে বলীয়ান করবে, এক্ষেত্রে তার অনুমোদনও অমূলক নয়। যদি এর দ্বারা একজনের প্রাণের বিনিময়ে দ্বীন শক্তিশালী হয় এবং পৌত্তলিকতা দূর্বল হয়, তাহলে তা বিরাট সম্মানের। একটি ব্যাপার যে বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুমিনদের প্রশংসা করে ঘোষণা করেছেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ...﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন।"[৫৯]

এরকম আরও অনেক আয়াত রয়েছে যাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের উদ্ভাসিত প্রশংসা করেছেন যারা নিজেদের উৎসর্গ করে।"[৬০]

---

[৫৭] সূরা আল বাকারাহঃ ২০৭

[৫৮] ইবনে আল-আরাবী'র আহকাম আল কুরআন (১/১১৬) এবং আর কুরতুবি (২/৩৬৩-৩৬৪)

[৫৯] সূরা আত্ তাওবাহঃ ১১১ (৯/১১১)

সপ্তমতঃ ইমাম আশ-শাওকানি নিজেকে ধ্বংস করার আয়াত সম্পর্কে বলেন, *“প্রকৃত সত্য হল এই যে, শব্দের কিছু সাধারণ প্রয়োগ রয়েছে যা অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট করা যায় না। এর মাধ্যমে দ্বীন ও দুনিয়ার সকল আত্ম-বিনাশমূলক কার্যক্রম বুঝায় যা ইবনে জারির আত তাবারি বর্ণনা করেছেন। সেই ব্যক্তির বিষয়টিও এর মধ্যে চলে আসে যে এমন একটি শত্রু সেনাদলকে আক্রমন করে যার কোন ক্ষতিই সে করতে পারে না কিংবা যা মুজাহিদদের কোন উপকার বা সুবিধাও বয়ে আনে না।”*[৬১]

আশ-শাওকানির এই সম্পর্কিত রায় হল, যদি এর মধ্যে কোন উপকার থাকে, তবে তা অনুমোদনীয়।

[৬০] তাফসীর আল কুরতুবী (২/৩৬৪)। আর জাস্‌সাস এর “আহকাম আল কুরআন” (৩/২৬২-২৬৩)

[৬১] তাফসির, ফাত্‌হ আল কাদির (১/২৯৭)

<u>বিভিন্ন মাযহাবের দলীলঃ</u>

ইমাম আবু হানীফার (রহীমাহুল্লাহ) অনুসারীবৃন্দ

অষ্টমতঃ ইবনে আবিদীন বলেন,

"কোন ব্যক্তির একাকী যুদ্ধ করার ব্যাপারে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা নেই, এমনকি যদিও সে মনে করে যে, সে নিশ্চিত মৃত্যুবরণ করবে, যতক্ষণ সে কিছু না কিছু অর্জন করে- (শত্রুকে) হত্যা কিংবা আহত করা কিংবা পরাজিত করার মাধ্যমে- এবং তা এ কারণে যে, উহুদের দিনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মুখেই বেশ সংখ্যক সাহাবাকে এরূপ করতে দেখা গেছে এবং তিনি এজন্য তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যদি কোনক্রমে সে জানে যে সে তাদের কোনই ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, তখন তার জন্য আক্রমন করার বিষয়টি অনুমোদনযোগ্য নয়, কেননা তা দ্বীনকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে কোন অবদানই রাখতে পারে না ।"[৬২]

নবমতঃ আশ-শারখাসি প্রসঙ্গত বলেন,

"এটিই আপাতত বলা যায় যে, এক্ষেত্রে আবশ্যক বিষয়টি হল শত্রুর ব্যুহে তার ঝাঁপিয়ে পড়া অবশ্যই কুফফারদের ক্ষতি সাধন করবে। (যদি বিষয়টি এমন হয়, তবে তা অনুমোদনযোগ্য)"[৬৩]

দশমতঃ আবু বকর আল জাসসাস (রহীমাহুল্লাহ) আশ-শায়বানির মত উদ্ধৃত করে উল্লেখ করেন যে,

"যদি সেরকম হয় (যেমন দ্বীনের কোন উপকার না হওয়া অথবা কুফফারদের ক্ষতি না হওয়া), তাহলে তার উচিত নয় নিজ সত্তাকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করা, কেননা এতে দ্বীনের কিংবা মুসলিমদের কোন কল্যাণ নিহিত নেই। কিন্তু যদি তার নিজ সত্তাকে উৎসর্গ করার মধ্যে দ্বীনের কিংবা মুসলিমদের কল্যাণ নিহিত থাকে, তাহলে এটি একটি সম্মানজনক ব্যাপার, যে বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন ... ।"[৬৪]

এবং আবু হানিফার ছাত্র আশ-শায়বানির এই রায় এখন পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহীমাহুল্লাহ) অনুসারীবৃন্দ

একাদশতঃ ইমাম আল কুরতুবী উল্লেখ করেন ইবনে খুওয়াইজ মানদাদ বলেন,

---

[৬২] হাশিয়াহ (৪/৩০৩)

[৬৩] শারহ আশ-শিয়ার আল-কাবীর (১/১৬৩-১৬৪)

[৬৪] আল জাসসাস এর "আহকাম আল কুরআন।" (৩/২৬২-২৬৩)

"কোন ব্যক্তির পক্ষে একাকী ১০০ জন কিংবা আরও বেশি শত্রু দলকে আক্রমন করার ক্ষেত্রে ... দুইটি বিষয় সামনে আসেঃ "যদি সে নিশ্চিত থাকে যে, সে তার আক্রমনের লক্ষ্যবস্তুকে হত্যা করবে এবং নিরাপদ থাকতে পারবে, তাহলে এটি ভাল; অনুরুপভাবে সে যদি যৌক্তিক বিচারে নিশ্চিত থাকে যে সে নিহত হবে, কিন্তু শত্রুর ক্ষতি সাধন করবে কিংবা ধ্বংস বয়ে আনবে কিংবা মুসলিমদের জন্য কল্যাণকর কিছু বয়ে আনবে, তাহলেও এটি অনুমোদনযোগ্য ।"[৬৫]

আল-কুরতবী এবং ইবনে আল-আরাবিয়্যার মন্তব্য ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে ।

ইমাম আশ-শাফিয়্যি (রহীমাহুলাহ) এর অনুসারীবৃন্দ

দ্বাদশত ঃ আল মুতী (রহীমাহুলাহ) এর আল মাযমু'র সমাপ্তিতে আমরা দেখতে পাই,

"যদি কুফফারদের সংখ্যা মুসলিমদের দ্বিগুন হয় এবং তারা পরাজয়ের আশঙ্কা না করে, তখন দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক ...আর যদি তাদের এই সম্ভাবনা হয় যে, তারা ক্ষতির সম্মুখিন হবে, তখন তাদের দুটি সম্ভাব্য পথ রয়েছে:

১. *তারা ফিরে যেতে পারে, এই আয়াতের ভিত্তিতে, "....... এবং তোমরা নিজেদের হাতে নিজেদের ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ কর না"*[৬৬]

২. *তারা পিছু না হটে অটল থাকতে পারে, এটিই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তা এই আয়াতের উপর ভিত্তি করে "হে মুমিনগণ! তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হবে তখন অবিচলিত থাকবে ...... ।"*[৬৭]

এ কারণে যে, মুজাহিদরা যুদ্ধ করে হত্যা করার জন্য অথবা নিহত হবার জন্য । যদি কুফফারদের সংখ্যা মুসলিমদের সংখ্যার দ্বিগুনের বেশি হয়, সেক্ষেত্রে তারা পিছু হটতে পারে । যদি তারা এ বিষয়ে প্রত্যয়দীপ্ত থাকে যে, তারা ধ্বংস হয়ে যাবে না, তখন এটিই উত্তম যে, তারা অনমনীয় থাকবে যাতে মুসলিমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়ে যায় । আর যদি তাদের এই সম্ভাবনা জন্মে যে, তারা ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন দুটি উপায় রয়েছেঃ

তখন পিছু হটার এক ধরনের বাধ্যবাধকতা তৈরী হয়ে যায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই আয়াতের মাধ্যমে, "..এবং তোমরা নিজেদের হাতে নিজেদের ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না"[৬৮]

[৬৫] তাঁর তাফসীর গ্রন্থের (২/৩৬৪)

[৬৬] সূরা আল-বাকারাহ্ঃ ১৯৫

[৬৭] সূরা আল-আনফালঃ ৪৫

[৬৮] সূরা আল-বাকারাহ্ঃ ১৯৫

পিছু হটার বিষয়টি মুস্তাহাব, তবে বাধ্যতামূলক নয়, কেননা যদি তারা নিহত হয়, তারা শাহাদাতের মাধ্যমে বিজয়ী হবে।”[৬৯]

ত্রয়োদশতঃ ইমাম আল গাজালি (রহীমাহুল্লাহ) বলেন,

“এই বিষয়ে কোন মতানৈক্য নেই যে একজন মুসলিম একাকীই কুফফারদের ব্যূহে আক্রমন করতে পারে, যদিও সে জানে যে সে মারা যাবে। শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত যেমন কুফফারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যেমন অনুমোদনীয়, এটিও সেরুপ অনুমোদনযোগ্য, কেননা এটি সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু যদি সে জানে যে, তার আক্রমন কুফফারদের কোন ক্ষতি সাধন করবে না- ঠিক যেন অন্ধ ও পঙ্গু একটি লোক নিজেকে শত্রুর সারির সামনে নিজেকে নিক্ষেপ করল। এরুপ ক্ষেত্রে এটি করা হারাম এবং এটি আত্ম-হনন সংক্রান্ত আয়াতের সাধারণ আওতার অর্ন্তভুক্ত হয়ে যায়; বরং সামনে অগ্রসর হওয়ার বিষয়টি তখনই কেবল অনুমোদনযোগ্য, যখন সে শত্রুকে হত্যা না করা পর্যন্ত নিজে নিহত হবে না (অথবা শত্রুর ক্ষতি করতে পারবে না) অথবা সে যখন নিশ্চিত থাকবে যে, মৃত্যুর ব্যাপারে তার এই তাচ্ছিল্য কুফফারদের নৈতিক মনোবল ভেঙ্গে দেবে এবং কুফফারদের মধ্যে এই আতঙ্ক ছড়িয়ে দেবে যে, তার মত বাকি মুসলিমদেরও মৃত্যুর কোন ভীতি নেই এবং তারা আলাহর রাস্তায় শাহাদাতকেই ভালবাসে।”[৭০]

এর ফলাফল কেবল তাৎপর্যপূর্ণই নয়, বিস্ময়করও বটে; একজন মুজাহিদ তার প্রভূর নিকট নিজেকে বিক্রয় করার পর প্রাচ্যে এবং পশ্চাতে আল্লাহর শত্রুদের মাঝে যে ব্যাপক ভীতি ও আতঙ্ক উদ্রেক করে, তা সীমালঙ্ঘন ও কুফরের প্রাসাদকে কাঁপিয়ে তুলে। সকল প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলারই জন্য।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (রহীমাহুল্লাহ) অনুসারীবৃন্দ

চতুর্দশতঃ ইমাম ইবনে কুদামাহ্ (রহীমাহুল্লাহ) বলেন,

“যদি শত্রুর সংখ্যা মুসলিমদের সংখ্যার দ্বিগুনের বেশি হয় এবং মুসলিমরা বাহ্যিকভাবে জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে, তখন এই সুযোগের জন্য দৃঢ়তা অবলম্বনই উত্তম; কিন্তু যদি তারা পিছু হটে তবে তাও অনুমোদনযোগ্য। এজন্য যে, তারা নিজেদের ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করতে বাধ্য নয় ....এই বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে যে, যদি তারা বাহ্যিকভাবে বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে, তাহলে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে মোকাবিলা করাই তাদের জন্য বাধ্যতামূলক। কিন্তু তারা যদি পরাজয়ের ব্যাপারেও বাহ্যিক দিক থেকে নিশ্চিত থাকে, সেক্ষেত্রে তাদের কৌশলগত পিছু হটাই পছন্দনীয়- কিন্তু যদি তারা দৃঢ় এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞা

[৬৯] আল-মাজমুয়া (১৯/২৯১)

[৭০] ইতহাফ আস-সাদাহ আল-মুত্তাকিন শারহ ইহইয়া উলুম আদ-দ্বীন (৭/২৬)

থাকে, তাহলে তাও তাদের জন্য অনুমোদনযোগ্য, কেননা, তাদের শাহাদাতের একটি লক্ষ্য আছে; আবার হতেও পারে যে তারাই বিজয়ী হয়েছে। যদি তারা বাহ্যিকভাবেই নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে থাকে, এমন অবস্থা তৈরী হয় যে, তারা দাঁড়িয়েও থাকতে পারে আবার কৌশলগত পিছু হটতেও পারে, সেক্ষেত্রে শাহাদাতের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে দৃঢ়চিত্ত থেকে লড়াই চালিয়ে যাওয়াই অধিক পছন্দনীয়; বিশেষত: এই আশায় (আল্লাহর সন্তুষ্টি), কেননা, তারা তো বিজয়ও অর্জন করতে পারে।"[৭১]

পঞ্চদশতঃ শাইখ আল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা (রহীমাহুল্লাহ) বলেন,

"মুসলিম কর্তৃক তাঁর সহীহ নাবী সালাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম থেকে এর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, ঐ ছোট বালকটি স্বয়ং নিজেকেই হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন 'মাসলাহাহ' (কল্যাণ) দ্বীনকে উচ্চকিত করে রাখার 'মাসলাহাহ' (কল্যাণ) এর জন্য। এজন্য চার ইমামই মুসলিমদের এই অনুমোদন দিয়েছেন যে, শত্রু ব্যূহে ঢুকে পড়লে শত্রুরা হত্যা করবে- এরকম জেনেও মুসলিমরা কুফফারদের ব্যূহে ঢুকে পড়তে পারবে। তারা এই বিষয়টিকে অনুমোদন দিয়েছেন এজন্য যে, এতে মুসলিমদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে.... ।"[৭২]

ইমাম দাউদ আস-সাবিরির অনুসারীবৃন্দ

ষষ্টদশত ঃ ইমাম ইবনে হাজম বলেন,

"আবু আইউব আনসারী কিংবা আবু মুসা আল-আশআরী এ দুজনের কেউই একটি ক্ষিপ্র শত্রু ব্যূহে একা ঢুকে পড়ে দৃঢ়তার সঙ্গে নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত লড়াই করে যাওয়াকে সমালোচনা করেননি ..... নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত আছে যে, সাহাবাদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি রসূলুলাহ সালাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম কে জিজ্ঞেস করেছিলেন বান্দার কোন বিষয়টি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কে হাসায়, তিনি জবাব দিলেন, "সেই বান্দা যে কোন বর্ম পরিধান ছাড়াই শত্রু বুহ্যে ঢুকে পড়ে"- যেখানে লোকটি তার বর্ম খুলে ফেলে এবং শত্রুর (ব্যূহে) ওপর তার মৃত্যু পর্যন্ত ঝাঁপিয়ে পড়ে।"[৭৩]

[৭১] আল মুগনি (৯/৩০৯)

[৭২] মাজমু আল ফাতাওয়া (২৮/৫৪০)

[৭৩] আল মুহাল্লা (৭/২৯৪)

কতিপয় পর্যালোচনাঃ

ছোট বালক এবং রাজা সংক্রান্ত হাদীসটি এ সম্পর্কিত সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ । এই হাদীসটি ব্যাখ্যা করে যে, যখন বালকটি দেখল যে বিশেষ একটি প্রক্রিয়ায় তার মৃত্যু দ্বীনকে ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ উপায় । যে রাজার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তখন পর্যন্ত তাকে জীবিত রেখেছিলেন, সেই রাজাকেই সে পরামর্শ দিল কিভাবে তাকে হত্যা করতে হবে । তার কাছে বেঁচে থাকার চেয়ে দ্বীনকে ছড়িয়ে দেয়াই বেশি তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছিল । এভাবেই সে তার নিজের জীবন ধ্বংসে অংশ নিয়েছিলেন । হ্যাঁ, সে এই ধ্বংসটি নিজ হাতে করে নাই, কিন্তু তার বলে দেয়া উপায় ছিল তাকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করার ক্ষেত্রে প্রধান কারণ ।

এই বিষয়ের দৃষ্টান্তটি এমন, খুব যন্ত্রনাদায়ক ক্ষত দ্বারা কষ্ট পেয়ে কেউ কোন একজনকে তাকে মেরে ফেলতে বলল । সে এক্ষেত্রে তার আত্মহত্যার জন্য দায়ী, কেননা, কে হত্যাটি করেছে সে প্রশ্নটি মুখ্য নয় বরং তার অনুরোধেই তাকে হত্যা করা হয়েছে । এটিই মূল ব্যাপার এবং এ বিষয়টির সঙ্গে প্রতিটি মানুষই একমত পোষন করবে । এ ক্ষেত্রে নিজের সিদ্ধান্তে নিজেকে হত্যা করার বিষয়টিও এরকম ।

কিন্তু যখন আলাহর রসূল সালালাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম এই ছেলেটির সত্যকে উচ্চকিত ও উদ্ভাসিত প্রশংসা করেছেন, তখন এ বিষয়টি পরিষ্কার হয় যে, এই কাজ দুটির পার্থক্যের কারণ হল, দুটি কাজের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য । তাই তিনি এই বালকটির ভূয়সী প্রশংসা করলেন । কেননা দ্বীনের বিজয়ের জন্যই সে পরোক্ষভাবে নিজেকে হত্যা করেছিল (এ বিষয়টি ঠিক ঐ বিষয়টির বিপরীত যেখানে কেউ অন্য আরেকজনকে তার কষ্টের কারণে হত্যা করতে বলে) । সুতরাং, এরকম আত্মবিসর্জনমূলক ফিদায়ী অনুমোদনের বিষয়টি স্বচ্ছ ফটিকের মত পরিষ্কার একটি ব্যাপার ।

অনুরুপভাবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের ভূয়সী প্রশংসা করলেন, যারা এ ছোট বালকটির রবকে বিশ্বাস করেছিল এবং যারা আগুনের গহ্বরে ঝাঁপ দিয়েছিল দ্বীনের বিজয়ের জন্য এবং দ্বীনকে এই পৃথিবীর চেয়ে বেশি পছন্দ করার কারণে । এমনকি, যে শিশুটি কথা বলে উঠেছিল তার মাকে সাহস যোগানের জন্য, যখন তার মা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইতস্ততঃ করছিল । আলাহ সুবহানাহু তা'আলা সত্য বলা ব্যতীত ঐ শিশুটিকে কথা বলাননি এবং আলাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের ব্যাপারে একটি পূর্ণাঙ্গ সুরাহ্ই নাযিল করলেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত আবৃত্তি করা হবে, যেখানে তাদের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাদের নিয়তি সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾

“তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, এটাই মহাসাফল্য ।”[৭৪]

তারা নিজেদের আত্মাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার কাছে বিক্রয় করে দ্বীনের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন । এবং সেটিই ছিল মহা সাফল্য ।

ফিরাউন কন্যার কেশবিন্যাসকারিণীর ঘটনাটিও অনুরুপ । আমরা আমাদের শারীয়াহ থেকে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছি যা এ হাদীস দুটি সংরক্ষণ করে এবং আমাদের শারীয়াহ গর্তের লোকদের এবং ফিরাউন কন্যার চুল বিন্যাসকারিণীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে; অন্যথায় ‘লা ইলাহা ইলাল্লাহ’ এর বাণীকে উচ্চকিত করার লক্ষ্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করার সাথে বিরোধিতা করে এমন কোন উপমা দৃষ্টিগোচর হয় না । সুতরাং, এই হাদীসদ্বয়ের সারবস্তু অধিকাংশ ইমামের মতানুসারে আমাদের শারীয়াহরই অংশ ।

বস্তুতঃ আমরা দেখি যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় এবং তাঁর পর সাহাবা (রদিআল্লাহু আনহু) দের সময়ে এই জাতীয় অপারেশন শুধু একবার নয়, বহুবার পরিচালিত হয়েছে । উপরন্তু, দ্বীনের সুরক্ষার বিষয়টিই একজন মুজাহিদের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য এবং এই দলিলগুলি আমাদের নিঃসন্দেহ করে যে, একজন মুজাহিদ দ্বীনের জন্য তার জীবন উৎসর্গ করবেন । আবু দুজানাহ (রদিআল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম এর মানব বর্ম ছিলেন এবং তা এটিই প্রমাণ করে যে, অন্যদের রক্ষায় দ্বীনের স্বার্থে একজন ব্যক্তির আত্মোৎসর্গ করার বিষয়টি বৈধ ।

---

[৭৪] সূরা আল বুরুজঃ **১১**

সার সংক্ষেপ

নিশ্চিত ও অবধারিত মৃত্যু দুটি ক্ষেত্রেই এককভাবে শত্রুব্যুহে ঢুকে পড়ার বিষয়টিতে উলামারা তাদের পরিষ্কার অনুমোদন দান করেছেন ।

অধিকন্তু, অধিকাংশ আলিমগণ এই অনুমোদনের জন্য কিছু শর্ত আরোপ করেছেনঃ

১. নিয়্যত

২. শত্রুর ক্ষতিসাধন

৩. শত্রুকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা

৪. মুসলিমদের ঈমান উজ্জীবিত করা

আল কুরতুবি এবং ইবনে কুদামাহ খালিছ নিয়্যত নিয়ে শত্রু ব্যুহে ঢুকে পড়ার বিষয়টিকে অনুমোদন দিয়েছেন, এমনকি এতে যদি কোন শর্ত পূরণ না হয়, কেননা, শাহাদাতের আকাঙ্খা একটি বৈধ বিষয় (মাশরু’) ।

যেহেতু অধিকাংশের ব্যাখ্যাতেই শাহাদাতমূলক অপারেশনের ক্ষেত্রে বড় কোন শর্তাধীন বিষয় যুক্ত নেই, সেহেতু উলেখিত মতটিই প্রণিধানযোগ্য । অধিকাংশগনই তাদের শর্তগুলো শারীয়াহর সাধারণ নীতির আওতায় উল্লেখ করেছেন । কিন্তু সাধারণ কোন নীতির আলোকে বিশেষ কোন নীতিকে সীমিত করা যায় না । হ্যাঁ, আমরাও বলছি যে, ফিদায়ী অপারেশনের এই কাজটিতে যদি কোন কল্যাণ না থাকে বা মুসলিম বা মুজাহিদদের কোন সুবিধাই তৈরী না করে, তাহলে তা পরিচালনা করা উচিত নয় কিংবা সেক্ষেত্রে এর চর্চাও কাঙ্খিত নয় । কিন্তু শরয়ী আইনের অনুমোদনের মূলনীতি থেকে ফিদায়ী অপারেশনের ব্যাপারটি আলাদা । কেননা, দৃঢ় কোন ভিত্তি ছাড়াই শাহাদাতের আকাঙ্খার বিষয়টিকে নিরুৎসাহিত করা একটি অন্যায় । অনুরুপভাবে, অন্য কোন বিকল্প উপায়ে মুসলিম বা মুজাহিদদের কল্যাণ হতে পারে, এমন উপায় বাদ দিয়ে কেবল স্বীয় কল্যাণের নিমিত্তে শাহাদাতের উপায় অবলম্বন করাও ঠিক নয় ।

বন্দীদের মানব ঢাল স্বরূপ ব্যবহার

শত্রুর প্রতি আক্রমণ এবং কোন বর্ম ছাড়া তাদের ব্যুহে ঝাঁপিয়ে পড়া (যা পরোক্ষভাবে নিজের মৃত্যু ঘটায়) যেমন প্রশংসনীয়, তেমনই ফিদায়ী অভিযানের বিষয়টিও প্রশংসনীয় যদি তাতে নিয়্যত বিশুদ্ধ থাকে। কেননা, অধিকাংশ আলিমের মতে পরোক্ষ মৃত্যু প্রত্যক্ষ মৃত্যুর সাথে তুলনীয়। আমরা ইনশাআল্লাহ্ তা বিশদ আলোচনা করব।

মুসলিম বন্দী, যাদেরকে শত্রুগণ ঢালস্বরূপ ব্যবহার করে তাদেরকে হত্যার বিষয়টি এর সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ, যদিও কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান।

উভয় ক্ষেত্রে মিল হল, দ্বীনের কল্যাণের জন্য একটি মুসলিমের জীবন বিসর্জিত হয়। পার্থক্য হল, ঢালস্বরূপ ব্যবহৃত বন্দীকে হত্যার বৈধতা জরুরি অবস্থার ভিত্তিতে বিবেচিত হয়; কেননা এমন কোন বিধান নেই যা অন্যকে হত্যার বৈধতা দেয় বরং ব্যক্তিস্বার্থের উর্দ্ধে সমষ্টিগত স্বার্থ এক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়। তাই, ঢালস্বরূপ ব্যবহৃত বন্দী হত্যার বিষয়টি "চরম প্রয়োজনে হারাম বৈধ" এবং "দুটি অকল্যাণের মাঝে অপেক্ষাকৃত কমটি বাছাই করা" এই মূলনীতিদ্বয়ের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়। কিন্তু ফিদায়ী অভিযানের ক্ষেত্রে সেরূপ কোন নিয়মের প্রয়োজন নেই, কারণ মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও শত্রুর ব্যূহে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে এবং তা কোন জরুরি অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।

অন্যকে হত্যা করা নিজেকে হত্যার চেয়েও বড় গুনাহ; আল কুরতুবী তাঁর তাফসীরে[৭৫] আলিমগণের ইজমা তুলে ধরেন যে, কেউ অন্যকে হত্যা করতে বাধ্য হলে তা একরকম বিষয় নয়। কেউ যদি বৃহত্তর মুসলিম স্বার্থে কোন মুসলিমকে হত্যার অনুমোদন দেয়, যদিও সরাসরি স্পষ্ট কোন দলিল নেই, একইভাবে, তাকে বৃহত্তর মুসলিম স্বার্থের বিবেচনায় আত্মত্যাগের বৈধতাও দিতে হবে, কেননা অন্যের জীবনের তুলনায় নিজের জীবন দেয়া কম ক্ষতিকর। এতটুকুই যথেষ্ট হত, যদি শহীদী অভিযানের বিষয়ে অন্য কোন দলিল প্রমাণ না থাকত, তবে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট দলিল প্রমাণ রয়েছে, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

ফকীহগণ পূর্বে এ বিষয়ে আলোকপাত করেননি, কারণ বর্তমানে যুদ্ধের নিয়ম কানুন, কলা কৌশল অনেক বদলে গেছে।

সাধারণভাবে কেবল মুসলিম নয়, জিম্মি (যে সকল কাফির মুসলিম রাষ্ট্রে অনুগত নাগরিক হিসেবে বসবাস করে) কাফিরদের মধ্যে বৃদ্ধ পুরুষ, নারী ও শিশু হত্যাও মুসলিমদের জন্য অবৈধ। মুসলিম বন্দীদের যদি ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তবে একান্ত প্রয়োজন না হলে তাদের প্রতি গুলি করা অবৈধ। কাফির নারী ও শিশুদের প্রতি যুদ্ধে সুবিধা লাভের জন্য অবশ্য প্রয়োজন ছাড়াও গুলি করা যায়। যুদ্ধে এরূপ কারণ দেখা দিতে পারে, তবে সুনির্দিষ্টভাবে সাধারণ কোন নাগরিক হত্যার উদ্দেশ্য থাকবে না। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে যখন রাতের অভিযানে হত্যাকৃত কাফির পুরুষদের, নারী ও

[৭৫] তাঁর তাফসীর গ্রন্থের (১০/১৮৩)

শিশুদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, *“তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত।”* অন্য বর্ণনায় আছে যে তিনি জবাবে বলেন, *“তারা তাদের পিতা হতে।”*[৭৬]

তবে মুসলিমদের ক্ষেত্রে গুলি করা বৈধ, কেবল যদি গুলি করা হতে বিরত থাকলে অধিক ক্ষতির আশঙ্কা হয়। যেমন ঢাল স্বরূপ ব্যবহৃত মুসলিমদের সংখ্যার তুলনায় অধিক সংখ্যক মুসলিম নিহত হবে অথবা মুসলিমরা পরাজিত হবে এবং তাদের ভূমি দখল করা হবে। এরূপ অবস্থায় ঢাল হিসেবে যেসব মুসলিম নিহত হবে, পরবর্তীতে তারা তাদের নিয়ত অনুযায়ী পুনরুত্থিত হবে।

অধিকাংশ আলিম প্রয়োজনে শত্রুকে আক্রমণ করা আবশ্যক মনে করেন, যদি তাতে কোন মানবঢাল নিহত হয়।[৭৭] ইমাম আশ শারবিনি “মুগনী আল মুহতাজ” গ্রন্থে দুটি শর্ত আরোপ করেনঃ

১। মুজাহিদ যথাসাধ্য ঢালকে আঘাত এড়ানোর চেষ্টা করবে

২। তারা ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত ব্যক্তিদের হত্যার ইচ্ছা পোষণ করবে না।

ইবন কাসীম (রহীমাহুল্লাহ) “আল ইনসাফ” গ্রন্থে বলেনঃ

“যদি তারা কোন মুসলিমকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, তবে সেই ঢালকে আঘাত করা অবৈধ যদি না বৃহত্তর কোন ক্ষতির আশঙ্কা করা হয়। সেরকম প্রয়োজন হলে কাফিরদের লক্ষ্য করে তাদের আঘাত করা বৈধ। এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই।”[৭৮]

শাইখ আল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যা (রহীমাহুল্লাহ) বলেনঃ

“আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, যদি কাফির সৈন্যরা মুসলিম বন্দীদের ঢালস্বরূপ ব্যবহার করে এবং তাদের আঘাত না করলে অবশিষ্ট মুসলিমদের ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দেয়, তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করা বৈধ, যদিও তাতে ঢালস্বরূপ ব্যবহৃত মুসলিমগণ নিহত হয়।”[৭৯]

ইবন তাইমিয়্যা (রহীমাহুল্লাহ) আরও বলেনঃ

---

[৭৬] ফাতহুল বারী (৬/১৪৬), আল-মানহাজ শারহ সহীহ মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ (১২/৪৯), সুনান ইবন-মাজাহ্ (২/৯৬৭), সুনান আবু দাউদ (৩/৫৬), মুসনাদ আহমাদ (৪/৩৮), আল-বায়হাকী (৯/৭৮), ইবন আবি শাইবাহ্ (১২/৩৮৮), আত-তাবারানী (রহ.)-এর 'আল-কাবীর' গ্রন্থের (৮/১০২), আল-বাঘাবী (রহ.)-এর 'শারহ আল-সুন্নাহ' (১০/৫০), আল হুমাইদী (২/৩৪৩, # ৭৮১), আত-তাহাবী (রহ.)-এর 'মা'আন আল-আছীর' গ্রন্থের (৩/২২১), 'জামী আল-উসূল' গ্রন্থে ইবন আল-আসীর (২/৭৩৩), ইবন আল আরাবী (রহ.)-এর 'আরদাত আল-আহওয়াসী (৭/৬৫)।

[৭৭] আশ-শাওকানী (রহ.) এর 'ফাতহুল কাদির' (৫/৪৪৭), মুগনী আল-মাহতাজ (৪/২৪৪), হাশিয়াত আদ-দুসুকী (২/১৭৮) এবং ইবন কুদামাহ্ (রহ.) এর আল মুগনী (১০/৫০৫)

[৭৮] 'আল হাশিয়া আলা আর-রাউদ' (৪/২৭১)

[৭৯] মাজমু আল-ফাতওয়া (২৮/৫৩৭-৫৪৬, ২০/৫২)

“যদি কাফিরগণ মুসলিমদের ঢালস্বরূপ ব্যবহার করে এবং (মুসলিমদের) আঘাত না করে কাফিরদের বিতাড়িত করা সম্ভব না হয়; তবে (মুসলিম বাহিনী) আঘাত করতে পারে, কারণ এ দুনিয়ায় তাদের উপরই দূর্যোগ-দুর্দশা আপতিত হয়, পরকালে যারা তা থেকে নিরাপদ থাকবে এবং এ ধরণের ঘটনা তাদের জন্য দুর্ভাগ্য বলে বিবেচনা করা হবে (হয়ত তারা এর প্রতিদান পাবে)। কেউ কেউ বলেন, “হত্যাকারী মুজাহিদ আর নিহত ব্যক্তি শহীদ।”[৮০]

অধিকাংশ হানাফী, মালিকী এবং সুফিয়ান আস সাওরী আক্রমণ অনুমোদন করেন, যখন কাফিরগণ মুসলিমদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। আক্রমণ হতে বিরত থাকলে ক্ষতি বা পরাজয়ের আশঙ্কা দেখা দিক বা না দিক, কারণ হিসেবে বলা হয় যে, এছাড়া জিহাদ কখনো সংঘটিত হবে না।[৮১] এই অবস্থানের দুর্বলতা পরিষ্কার, মুসলিম জীবনের পবিত্রতা অত্যাধিক, কোন কারণ ছাড়া তা হরণ করা অনুমোদিত নয়। অধিকন্তু, এ ধরণের মানবঢাল সর্বত্র ব্যবহৃত হয় না আর তাই জিহাদ আবশ্যক রূপে থমকে দাঁড়াবে না।

কাফির নারী, শিশু ও বৃদ্ধ পুরুষদের ঢাল স্বরূপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে, যদি একান্ত আবশ্যক নাও হয়, যুদ্ধের সাধারণ প্রয়োজনে তাদের আক্রমণ করা বৈধ। অধিকাংশ হানাফী, মালিকী ও হাম্বলীদের এই মত।[৮২] তবে মালিকীগণ ভিন্নমত পোষণ করেন। যদিও তারা একান্ত প্রয়োজন ছাড়াও কাফিরগণ কর্তৃক ব্যবহৃত মুসলিম মানবঢাল আক্রমণের অনুমতি দেয় - এ এক আশ্চর্য ভিন্নমত পোষণ; কিন্তু সংক্ষিপ্ততার খাতিরে আমরা এখানে কারণ আলোচনা করবো না।[৮৩]

---

[৮০] মাজমু আল-ফাতওয়া (১০/৩৭৬)

[৮১] ফাতহুল কাদির (৫/৪৪৮), ইমাম আল-জাস্‌সাস (রহ.)-এর ‘আহকাম আল-কুরআন’ (৫/২৭৩), মিনহাজ আল-জালিল (৩/১৫১)

[৮২] আস-সিয়ার আল-কাবীর (৪/১৫৫৪), মুগনী আল-মুহতাজ (৪/২২৪) এবং আল-মুগনী (১০/৫০৪)

[৮৩] দারদির (রহ.) এর আশ-শার্‌হ আল-কাবীর (২/১৭৮) এবং মিনহাজ আল-জালিল (৩/১৫০)

হত্যাকর্মে সহায়কের ব্যাপারে আলিমগণের অভিমত

বাঁচার আশা না করে শত্রু ব্যুহে ঝাঁপিয়ে পড়া মহোত্তম উপায়, যার মাধ্যমে মুজাহিদ নিজের আত্মত্যাগে ও হত্যায় ভূমিকা রাখে। নিজের মৃত্যুতে ভূমিকা রাখা নিজেকে হত্যা করার মতোই। মালিকী, শাফেঈ এবং হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ আলিম পরোক্ষ হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিকে শাস্তিস্বরূপ প্রত্যক্ষ হত্যাকাণ্ডের শাস্তির ন্যায় কতলের নির্দেশ দিতেন।

আল বুখারীতে প্রমাণস্বরূপ পাওয়া যে, এক বালককে হত্যা করা হলে উমর (রদিআলাহু আনহু) বলেনঃ

"যদি সানার সকল অধিবাসী এতে (হত্যাকাণ্ডে) অংশ নিত, তাঁর জন্য আমি সকলকে কতলের নির্দেশ দিতাম।" যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে, যদি পাল্টা হত্যার বিধান রদ করা হত, তবে খুনীর সংখ্যা বাড়ত, কারণ শাস্তির পরোয়া না করে খুনীরা এক বা একাধিক হত্যাকাণ্ড ঘটাত। রক্তপণ দিয়ে সকল খুনীদের, বিশেষত ধনীদের বিরত রাখা যেত না।[৮৪]

তাই সংশ্লিষ্ট সকলকেই হত্যা করা যথার্থ। একইভাবে, কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, যে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করল, সে যেন গোটা মানব জাতিকে হত্যা করল।

তাই শত্রুর মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে যে নিজের মৃত্যু ঘটাবে, সে তো প্রশংসার পাত্র, কারণ আল্লাহ্‌র বাণী উচ্চে তুলে ধরার মহান উদ্দেশ্যেই সে তা করেছে। কোন অস্ত্র বা পন্থায় সে তা করেছে তাতে কিছু যায় আসে না। আমরা ইতিপূর্বে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ প্রমাণ তালিকায় সাহাবাগণের আমল উল্লেখ করেছি এবং সেইসব আমলের ক্ষেত্রে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে কোন সমালোচনা বা বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয় নি।

সুতরাং মুসলিমদের বৃহত্তর স্বার্থে (মাসলাহাহ) যদি শত্রুগণের সামনে নিজেকে বিলিয়ে দেয়া বৈধ হয়, তাহলে একই উদ্দেশ্যে সরাসরি নিজেকে হত্যা করা কেন বৈধ হবে না? বিশেষত যখন এ ধরণের আত্মত্যাগ ছাড়া অন্য উপায়ে কাফিরদের উপর এ ধরণের ক্ষতিসাধন সম্ভবপর না হয়। এ ক্ষেত্রে মুজাহিদগণ ঐ সকল সাধারণ বিধান হতে অব্যাহতি পায়, যেখানে নিজের জীবন নেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

---

[৮৪] ইমাম আশ-শাওকানী (রহ.) এর 'আস-সাইল আল-জাররার' (৪/৩৯৭), তাফসীর আল-কুরতুবী (২/২৫১), ইবন তায়মিয়্যা (রহ.) এর 'মাজমুয়া আল-ফাতওয়া' (২০/৩৮২), আল-বাহ্‌ও আর-রিয়াক (৮/৩৫৪), আস-সুনানীর সুবুল আস-সালাম (৩/৪৯৩) এবং আস-সামানী এর ক্বাওয়াতি আল-আদিলাহ্‌ (২/২৪৩)

‘শহীদ’-এর সংজ্ঞাঃ

ইমাম আন-নববী (রহীমাহুল্লাহ) সাতটি কারণ উল্লেখ করেছেন যে, শহীদ-কে কেন ‘শহীদ’ বলা হয়[৮৫]ঃ

১. কারণ, আল্লাহ্ তা’আলা এবং তাঁর নাবী (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর (শহীদের) জান্নাতে প্রবেশের সাক্ষ্য দিয়েছেন।

২. কারণ, তিনি তাঁর রবের কাছে জীবিত আছেন।

৩. কারণ, (শহীদের) আত্মা নেয়ার সময় রহমতের ফিরিশতা সাক্ষী হয়ে থাকবে।

৪. কারণ, তিনি হবেন তাঁদের মধ্যে একজন যাঁরা পুনঃরূত্থান দিবসে পুরো জাতির সামনে সাক্ষ্য দিবে।

৫. কারণ, তাঁর ঈমান এবং ভাল পরিণতি বাহ্যিকভাবে সাক্ষী হয়ে থাকবে।

৬. কারণ, সে নিজেই তাঁর মৃত্যুর উপর সাক্ষী হয়ে থাকবেন।

৭. কারণ, তাঁর আত্মাকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে জান্নাত প্রত্যক্ষ করানো হবে।

ইবন হাজার (রহীমাহুল্লাহ) ‘শহীদ’ শব্দটির ১৪টি অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন যাতে এর সঠিক মর্যাদা বোঝা যায় এবং এর বেশির ভাগ অর্থই আল্লাহর পথে নিহত হওয়া ছাড়া অন্য কিছুকে বোঝানো হয় নি।[৮৬]

চার মাযহাবের আলিমগণ ‘শহীদ’ শব্দটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন, নিম্নে তা উল্লেখ করা হলঃ

হানাফী মাযহাবের মত অনুসারেঃ

হাসিয়া বিন আবেদীন (রহীমাহুল্লাহ) বলেন, “*...যাকে মুশরিকেরা হত্যা করেছে অথবা নিহত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে যুদ্ধের ময়দানে, এবং যার দেহ থেকে আহত হওয়ার চিহ্ন পাওয়া যায়, তা প্রকাশিত হোক অথবা অপ্রকাশিত, যেমনঃ চোখ অথবা দেহের অন্য কোন জায়গা থেকে রক্ত নির্গত হওয়া।*”[৮৭]

---

[৮৫] শারহ সহীহ মুসলিম (১/৫১৫) এবং আল-মাজমু (১/২৭৭)

[৮৬] ফাতহুল বারী (৬/৪৩)

[৮৭] হাশিয়াহ্ ইবন আবিদীন (২/২৬৮) এবং ফাতহুল কাদির (২/১৪২)

আয্‌-যাইলাই (রহীমাহুল্লাহ) বলেন, *"... যদি কেউ বিদ্রোহী, সীমালংঘনকারী অথবা দস্যুদের মত শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা যায়, তা প্রত্যক্ষভাবেই হোক অথবা পরোক্ষভাবে, তাহলে সে শহীদ। কিন্তু কারো মৃত্যু যদি এ রকম শত্রুদের হাতে না হয়, তাহলে সে শহীদ নয়।"*[৮৮]

মালিকী মাযহাবের মত অনুসারেঃ

আদ-দারদির (রহীমাহুল্লাহ) তাঁর 'আশ-শার আল-কাবীর' গ্রন্থে লিখেছেন, *"...তিনি হচ্ছেন একমাত্র সেই ব্যক্তি যিনি বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা যান, এমনকি যদি তিনি মুসলিমদের ভূমিতেও মারা যান, যেখানে বিদ্রোহীরা মুসলিমদের ভূমিতে আক্রমণ চালায়, অথবা ঘুমিয়ে থাকা বা অজ্ঞান থাকা অবস্থায় মারা যান, যখন তিনি যুদ্ধ করতে সুযোগ পান নি অথবা তাকে কোন মুসলিম এই মনে করে হত্যা করেছিল যে, তিনি কাফির অথবা তিনি ঘোড়ার পায়ে পৃষ্ঠ হয়ে মারা যান অথবা ভুলবশতঃ তার নিজের তরবারী অথবা তীরের আঘাতে মারা যান অথবা যুদ্ধের ময়দানে কোন দেয়ালের চাপা পড়ে অথবা কোন উঁচু ভবন থেকে পড়ে মারা যান।"*[৮৯]

শাফে'ঈী মাযহাবের মত অনুসারেঃ

ইবন হাজার (রহীমাহুল্লাহ) বলেন তিনি হচ্ছে, *"...সেই ব্যক্তি যিনি একনিষ্ঠভাবে কুফ্‌ফারদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা যান, তাদের সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং তাদের থেকে পিছনে পালিয়ে যান নি।"*[৯০]

'মুগনী আল-মুহ্‌তাজ'-গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, *"... তিনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যিনি শত্রুদের সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং তাদের থেকে পিছনে পালিয়ে যান নি, বরং কাফিরদের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় নিহত হন। এটি এ জন্যে করা হচ্ছিল যে, কোন প্রকারের দুনিয়াবী চাওয়া-পাওয়া ছাড়াই যাতে আল্লাহর কালিমাকে সবার উপরে তুলে ধরা হয় এবং অবিশ্বাসীদের কালিমাকে সবচেয়ে নিচে নিক্ষেপ করা হয়।"*[৯১]

---

[৮৮] তিবয়ান আল-হাক্বীক্ব (১/২৪৭) এবং বাহ্‌ও আর-রিয়াক্ব (২/২১১) [অনুবাদকের টিকাঃ হানাফী মাযহাবের আলিমগণের মধ্যে তিনিই একমাত্র এই মত পোষণ করেছেন, পরবর্তীতে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে।]

[৮৯] আশ-শারহ আল-কাবীর (১/৪২৫)

[৯০] ফাতহুল বারী (৬/১২৯)

[৯১] মুগনী আল-মুহতাজ (১/৩৫০)

হাম্বালী মাযহাবের মত অনুসারেঃ

'কিশাফ আল-ক্বিনা'-গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, *"... শহীদ হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যিনি কাফেরদের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় মারা যান।"*[৯২]

ইবনে কুদামাহ্ (রহীমাহুল্লাহ্) বলেছেন, *"... তাই যদি কোন শহীদের নিজের অস্ত্র থেকে গুলি এসে তার নিজের গায়ে বিদ্ধ হয় এবং এতে সে মারা যায়, তাহলে তিনি তার মতই মৃত্যু বরণ করলেন, যেমন কেউ শত্রুদের হাতে নিহত হল।"* আল-কাজী (আইয়াদ) বলেছেন, *"তাকে গোসল করাতে হবে এবং তার জানাজার সালাতও পড়তে হবে, কারণ তিনি কাফিরদের হাতে মারা যান নি। এটি তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে যিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রের বাইরে এসে মারা গিয়েছেন।"* এ মতের সমর্থনে আবু দাউদ[৯৩] (রহীমাহুল্লাহ্) বর্ণনা করেন, *"মু'আবিয়া ইবন আবু সালাম নাবী করীম সালাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম-এর সাহাবীদের কোন এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা জুহায়না বংশের এক গোত্রের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালালাম। তখন মুসলমানদের এক ব্যক্তি কাফিরদের এক ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে তার উপর তরবারির আঘাত হানে। সে তরবারির আঘাত ভুলক্রমে কাফিরদের অতিক্রম করে তার নিজের গায়েই পতিত হল এবং তিনি ভীষণভাবে আহত হলেন। তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'হে মুসলমানের দল! তোমাদের ভাই কোথায়, তার খবর নাও।' লোকজন তাঁর দিকে দৌড়ে গিয়ে দেখতে পেল যে, তিনি মারা গেছেন। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃতদেহ তাঁরই রক্তাক্ত কাপড়ে জড়িয়ে নিলেন এবং জানাযার নামায পড়ে তাঁকে দাফন করলেন। এরপর সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তিনি কি শহীদ হয়েছেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, সে শহীদ হয়েছে, আর আমি এর সাক্ষী।"*[৯৪]

কিছু মানুষ আছেন, যারা মুজাহিদীনদের এই ফিদায়ী আক্রমণকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন, কারণ এর মাধ্যমে একজন মুজাহিদ নিজেকেই হত্যা করে ফেলে। এই সন্দেহকে দূর করার জন্য আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, অনেক সময়ে 'শারীয়াহ্' দু'টি আমলকে তাদের নিয়্যতের কারণে দু'টি ভিন্ন রায় প্রদান করে থাকে, অথচ যাদের বাহ্যিক রূপ একই ছিল। উদাহরণ স্বরূপঃ

- বিবাহিত তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে বিয়ে করা জায়েয, কিন্তু যদি কেউ এই উদ্দেশ্যে বিয়ে করে যে, সে তাকে পরবর্তীতে তার প্রথম স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দিবে, তাহলে তা নাজায়েয হবে।

- কেউ যদি ঋণদাতাকে অর্থ ফেরত দেয়ার সময়ে মূল অর্থের চেয়ে কিছু অর্থ বেশি দেয় তবে তা অনুমদিত, কিন্তু তারা যদি এ বিষয়ে পূর্ব থেকেই শর্ত করে নেয়, তাহলে এটি নিষিদ্ধ এবং এটি সুদ হিসেবে গণ্য হবে।

---

[৯২] কাশ্‌ফ আল-ক্বিনা (২/১১৩)

[৯৩] সুনান আবু দাউদ (২৫৩৯)

[৯৪] আল মুগনী, কিতাব আল জানায়িজ (২/২০৬)

- কেউ যদি জিহাদ করে আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য তাহলে সে মুজাহিদ। কিন্তু কেউ যদি তা করে মানুষকে দেখানোর জন্য এবং বীরত্বের উপাধি লাভের আশায়, তাহলে সে হবে জাহান্নামে প্রবেশকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি।
- কেউ যদি ভুলবশতঃ নিজের অস্ত্রের আঘাতে মারা যায়, তাহলে সে শহীদ। কিন্তু সে যদি নিজেকে হত্যা করে দেয় শারীরিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, তাহলে সে জাহান্নামে যাওয়ার উপযুক্ত হয়ে গেল।

এই সকল উদাহরণগুলো ঐ হাদীসের ভিত্তিতে নেয়া হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে, "*প্রত্যেকটি আমলই তার নিয়্যতের উপর নির্ভর করে ... ।*"[৯৫] এসকল ধারণা থেকে এটি সুস্পষ্ট হয় যে, শহীদ হওয়ার বিষয়ে এটি বিবেচ্য নয় যে, সে কার হাতে নিহত হল বরং এটি তার নিয়্যতের উপর বিবেচ্য বিষয় হবে। সুতরাং যদি কারো নিয়্যত সঠিক না হয় এবং সে শত্রুদের হাতে মারা যায়, তাহলে সে জাহান্নামে যাওয়ার উপযুক্ত হবে। ঠিক একই বিধান প্রযোজ্য হবে তার বেলায়ও, যদি কেউ যন্ত্রণা অথবা জীবনের প্রতি হতাশাগ্রস্থ হওয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিজেকে হত্যা করে। অন্যদিকে, যদি কেউ সঠিক নিয়্যতের উপর মারা যায় তাহলে সে জান্নাতে যাবে, যদিও সে শত্রুর হাতে মারা যায় অথবা নিজের ভুলের কারণে নিজের হাতেই নিহত হয়। এবং ঠিক একইভাবে, যদি কেউ নিজেকে হত্যা করার কাজে সহযোগীতা করে এই উদ্দেশ্যে যে, এর দ্বারা দ্বীনের বৃহত্তর কল্যাণ হতে পারে, তাহলে সেও জান্নাতে যাবে। যেমনটি 'আসহাবুল উখদুদ'-এর বালকটি ক্ষেত্রে হয়েছিল।

---

[৯৫] বুখারী থেকে বর্ণিত (১), আলবানী কর্তৃক তাঁর আত-তারগীবে সহীহ ভাবে বর্ণিত (১০,১৩৩০)

'আত্মহত্যা'-এর সংজ্ঞাঃ

'আল-ইন্তিহার' (আত্মহত্যা) আরবী শব্দটি 'যে আত্মহত্যা করে' তার ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজেকে হত্যা করেছে। 'লিসান আল-আরাব' এবং 'তাজ আল-উরুস' থেকে নেয়া হয়েছে।[৯৬]

কতিপয় আলিম 'আত্মহত্যা' এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "যদি কেউ নিজেকে হত্যা করে ফেলে তা যে কোন উপায়েই হোক না কেন!"

অন্য আলিমগণ বলেছেন, *"যদি কেউ নিজেকে ভীষণ দুঃখে অথবা রাগে হত্যা করে ফেলে।"*[৯৭]

আবার অন্য আলিমগণ বলেছেন, *"যদি কেউ নিজেকে এই ধ্বংসাত্মক কাজে নিক্ষেপ করে, দুনিয়াবী কোন ক্ষতির আশংকায়।"*[৯৮]

মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾

" ... এবং কখনো (স্বার্থের কারণে) একে অপরকে হত্যা করো না, অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি মেহেরবান। যে কেউই বাড়াবাড়ি ও জুলুম করতে গিয়ে এই (হত্যার) কাজ করে, অচিরেই আমি তাকে আগুনে পুড়িয়ে দেবো, (আর) আল্লাহর পক্ষে এ কাজ একেবারেই সহজ (মোটেই কঠিন কিছু নয়)।"[৯৯]

ইমাম আল-কুরতুবী (রহীমাহুল্লাহ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, *"এই আয়াতে যা বলা হয়েছে সে ব্যাপারে আলিমগণ এক মত পোষণ করেছেন যে, দুনিয়াবী কোন স্বার্থে বা সম্পদের লোভের কারণে একে অপরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা নিষিদ্ধ, এই নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে, যে নিজেকে একই কারণে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, এমন কোন পন্থায় নিজেকে*

---

[৯৬] আল-ক্বামুস আল-মুহিত (৬১৬)

[৯৭] এটি দুশ্চিন্তা, ক্ষুধা, পিপাসা, যন্ত্রণা ইত্যাদির অন্তর্ভূক্ত।

[৯৮] যেমনটি হাদীসে বর্ণিত আছে, "তোমাদের পূর্বেকার (উম্মাতের) এক ব্যক্তির একটি হাতে যখম হয়েছিল। তা তাকে অসহ্য যন্ত্রণা দিচ্ছিল। সে চাকু বের করে হাত কেটে ফেলল। কিন্তু কিছুতেই তার রক্তক্ষরণ বন্ধ হলো না। অবশেষে সে মারা গেলো। তোমাদের মহান রব বললেন, 'আমার বান্দা দ্রুত মৃত্যু ডেকে নিয়ে আসল তাই আমি তার জন্যে বেহেশত হারাম করে দিয়েছি।'" হাদীসটি সহীহ বুখারী (৩৪৬৩), সহীহ মুসলিম (১১৬), আলবানী (রহ.)-এর সহীহ আত-তারগীব (২৪৫৬) এবং আস-সিলসিলা আস-সাহিহা (৪৬২)

[৯৯] সূরা নিসাঃ ২৯-৩০

বিপর্যয়ে নিক্ষেপ করে যার মাধ্যমে নিজের জীবনের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে যায়, যা এই আয়াতের দ্বারা ' ... এবং কখনো (স্বার্থের কারণে) একে অপরকে হত্যা করো না' বোঝানো হয়েছে ।"[১০০]

এ কারণেই বলা যেতে পারে আমরা শারীয়াহ্ থেকে প্রমাণ পাই যে, 'আত্মহত্যা' নিষিদ্ধ, কারণ এর মাধ্যমে কেউ নিজেকে ইসলামের গ্রহণযোগ্য কোন কারণ ছাড়াই হত্যা করে ফেলে ।

এবং এ অগ্রহণযোগ্য কারণগুলো দেখিয়ে যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে তার ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে কোন প্রকারের মতপার্থক্য নেই যে, এ ধরনের কাজ করা হচ্ছে একটি বড় কবীরা গুনাহ্ এবং তাকে অবশ্যই এর জন্য জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে ।

শুধু তাই নয়, বরং ইসলাম এর চেয়েও কম স্তরের পাপ কাজকেও নিষিদ্ধ করেছে, যেমনঃ বিপদে পতিত হওয়ার পরে হতাশা হয়ে মৃত্যু কামনা করা, যা হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি ।

"তোমরা কেউ বিপদে পতিত হলে মৃত্যুকে কামনা করো না, বরং এতে অবশ্যই দো'আ করবে, 'হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত জীবিত রাখ, যতক্ষণ জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হয়, আর আমাকে মৃত্যু দান কর, যখন মৃত্যুই হয় আমার জন্য কল্যাণকর' ।"[১০১]

এবং অন্য আরেকটি বর্ণনায় ইবনে হিব্বান (রহীমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন, " *... যদি কেউ দুনিয়াবী কোন বিপদের মধ্যে পতিত হয় ... ।"*[১০২]

সুতরাং দুঃখ, যন্ত্রণা অথবা দুনিয়াবী কোন ক্ষতির আশংকা মনে করে আত্মহত্যা করা হয় । যেমনঃ দুনিয়াবী নিদারুণ দূর্দশা, কঠিন অসুখ অথবা এমন কারণে যার যৌক্তিক কোন ভিত্তি নেই, যেমনঃ খেলা-ধূলা । তাই, দুনিয়াবী কোন কারণ থাকুক বা না থাকুক যদি ইসলামের কোন গ্রহণযোগ্য কারণ না হয়, তাহলে তা শারীয়াহ্তে নিষিদ্ধ, যা ইতিপূর্বে কুরআন ও হাদীস থেকে উল্লেখ করা হয়েছে ।

সকল প্রকারের দলিল-প্রমাণ 'আত্মহত্যা'-কে নিষিদ্ধ করে যদি দুনিয়াবী কোন কারণ বিদ্যমান থাকে যেমনঃ মারাত্মক যন্ত্রণা, মানসিক দুঃখ-কষ্ট অথবা ধৈর্য্যহীনতা; কিন্তু এটি আলাহ্র কালিমাকে বুলন্দ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় । শত্রু বাহিনীর ভিতরে

---

[১০০] তাফসীর আল-কুরতুবী (৫/১৫৬)

[১০১] সহীহ আল-বুখারী (৫৬৭১, ৬৩৫১), সহীহ মুসলিম (২৬৮০), ইবনে মাজাহ্ (রহ.) সহীহ বলেছেন তাঁর 'আল-মুহাল্লা' গ্রন্থে (৫/১৬৭), ঠিক অনুরূপ ভাবে ইবন হাজার (রহ.) তাঁর ফাতহুল বারী গ্রন্থে (১৩/২৩৪), এবং আলবানী (রহ.) তাঁর সাহীহ আল-জামী গ্রন্থে (৭৬১১, ৭২৬৫)

[১০২] আল-মুহাল্লা (৫/১৬৫), এ সনদটিকে ইবনে হাজম (রহ.) সহীহ বলেছেন, নাসাঈ (১৭১৬), এ সনদটিকে আল-আলবানী (রহ.) সহীহ বলেছেন ।

বর্ম পরিধান করা ছাড়াই একজন মুজাহিদের প্রবেশ করা এবং তাদের উপর যুদ্ধের জন্য ঝাঁপিয়ে পরার বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বেই দলিল-প্রমাণাদি উল্লেখ করেছি, একজন মুজাহিদ এ ধরনের কাজ করলে তা 'আত্মহত্যা'র সাধারণ হুকুমের বহিঃর্ভূত হবে।

যে ব্যক্তি নিজেকে বিশুদ্ধ নিয়্যতে জীবন দান করে, এই উদ্দেশ্যে যাতে আল্লাহর কালিমাকে উঁচু করা হয় এবং শত্রুদের বড় ধরনের ধ্বংস ও ক্ষতি এবং ভীত সন্ত্রস্ত করা হয় - আমরা কিভাবে তাকে আত্মহত্যাকারী বলে আখ্যায়িত করতে পারি? এটি হবে তাঁর ব্যাপারে একটি বড় ধরনের অপবাদ। আমরা বলব, আত্মহত্যার নিষিদ্ধতা হচ্ছে দূর্বল ঈমানের বহিঃপ্রকাশ আর অন্যদিকে একজন মুজাহিদ ফিদায়ী আক্রমণ চালিয়ে তাঁর দৃঢ় ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। সূরা 'আল-বুরুজ'-এর গর্ত খননকারী লোকদের সামনে সেই বালকটি তার নিজেকে হত্যা করার এক মহৎ উদাহরণ পেশ করেছে এবং তাঁর এই কাজটি ছিল প্রশংসনীয়। তা বৈধ ছিল, কারণ এটি সে কোন দুঃখ দূর্দশায় পতিত হয়ে করেনি, বরং তাঁর দৃঢ় ঈমানেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। একইভাবে, রসূল সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পথে শাহাদাতের কামনা করেছেন একবার, দু'বার নয় বরং তিনবার [যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি]। সুতরাং এখন 'আত্মহত্যা'-র অবৈধতার যৌক্তিক কারণগুলো পরিষ্কার এবং 'ফিদায়ী আক্রমণ'-এর বৈধতা ও প্রশংসার বিষয়টিও সুস্পষ্ট, যা কেবল আলাহর দ্বীন এবং তাঁর পথে জিহাদের বিজয় নিয়ে আনার জন্য করা হয়ে থাকে।

শাইখ মুহাম্মাদ নাসির আদ-দ্বীন আল-আলবানী (রহীমাহুল্লাহ) এর অভিমতঃ

শাইখকে (রহীমাহুল্লাহ) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল[১০৩]ঃ

"বর্তমান যুগে জঙ্গী হামলার বিষয়ে একটি প্রশ্ন এবং প্রশ্নটি তখন করা হয়েছিল যখন ইহুদীরা মুসলিমদের উপর দমন-নিপীড়ণ চালাচ্ছে ... তাই এই সকল আত্মঘাতী হামলাকারীরা বিস্ফোরক নিজেদের শরীরের সাথে বেঁধে শত্রু বাহিনীর ভেতরে প্রবেশ করছে অথবা ট্যাংকের নিচে গিয়ে নিজেদের বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে এবং মারা যাচ্ছে ... এ ব্যাপারে ইসলামের রায় কি? এটি কি 'আত্মহত্যা' নাকি অন্য কিছু?"

শাইখ-এর জবাব:

"এটি 'আত্মহত্যা' নয়, কারণ 'আত্মহত্যা' হচ্ছে যদি কেউ নিজেকে হত্যা করে তার জীবনের কঠিন অবস্থা থেকে পালানোর জন্য। কিন্তু যে বিষয়টি তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছো তা আত্মহত্যা নয়; বরং তা আল্লাহর পথে জিহাদ ... (অর্থাৎ সে মুজাহিদ)।

তাই, যদি মুজাহিদ কমান্ডার এই ফিদা'য়ী (আত্ম-বিসর্জনকারী) আক্রমণকারীর উপর নির্ভরশীল না হয়ে থাকেন এবং যদি তিনি মনে করেন যে, তার এ ধরনের বিসর্জনের ফলে মুসলিমদের বড় ধরনের বিজয় আসার সম্ভবনা আছে, যেমনঃ কাফির ও মুশরিকদের একটি বিশাল বাহিনীকে ধ্বংস করা অথবা তাদের বড় ধরনের ক্ষতি সাধন করার সম্ভবনা থাকে, তাহলে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার তার রয়েছে এবং তার এই সিদ্ধান্তের অবশ্যই আনুগত্য করা প্রয়োজন। এবং এটি তখনও আনুগত্য করা আবশ্যক, যখন ফিদা'য়ীকারীর এই সিদ্ধান্তের প্রতি অন্তর সন্তুষ্ট না থাকে।"

প্রশ্নকারী মাঝখানে আবার জিজ্ঞাসা করলেন,

"তাহলে কি এ ধরনের কাজে কোন সমস্যা নেই?"

শাইখ জবাব দিলেন,

"না, এ ধরনের কাজে কোন ধরনের সমস্যা নেই। আমরা (আলিমগণ) এ ধরনের (মহৎ) কাজের উপর 'আত্মহত্যা'-এর মত (জঘন্য) উপাধি দিতে পারি না। আর ইসলামের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য গুনাহ্গুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে 'আত্মহত্যা'। কেউই এ ধরনের কাজ করতে পারে না, একমাত্র যে তার প্রতিপালকের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর নিয়ামাতকে অস্বীকার করে এবং তাঁর কাছে কোন প্রকারের আশা-আকাংখা রাখে না।

[১০৩] 'সিলসিলা আল-হুদা ওয়ান-নুর' ক্যাসেটের ধারাবাহিক সিরিজের # ১৩৪ নং পার্ট-এর ২৩:২৪ মি. শাইখ এটি বলেছেন।

আর মুজাহিদীনদের বিষয়টি হচ্ছে তারা আল্লাহর পথে অগ্রসর হচ্ছে, যেভাবে পূর্ববর্তী সত্যনিষ্ঠগণ, সাহাবী (রদিআল্লাহু আনহু)-গণ এবং তাঁর পরবর্তীগণদের থেকে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁরা কুফ্ফারদের বাহিনীর ভেতরে একাকী তরবারি নিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে সবর এবং দৃঢ়তার সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করেছেন, যতক্ষণ না তাঁরা শহীদ হয়েছেন, কারণ তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে *'তরবারির ছায়ার নিচেই রয়েছে জান্নাত'* ।

তাহলে এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য কি দাড়াল! এখানে একজন নিজেকে শহীদ করছেন আল্লাহর পথে জিহাদ করার মাধ্যমে আর অপরজন জীবনের কষ্ট-যন্ত্রনা থেকে পালানোর জন্য আত্মহত্যা করছে।

তবে কেউ যদি তা করে বিশৃংখলভাবে এবং নিজের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের উপর, তাহলে তা নিজেকে ধ্বংসের মত ভয়ঙ্কর কাজের মধ্যে পরে যেতে পারে। কিন্তু যদি এটি সম্পন্ন করা হয় মুজাহিদ কমান্ডারের নির্দেশে, যেখানে তিনি যুদ্ধের পরিস্থিতি এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত আছেন তাহলে তা বৈধ। তখন এটি শুধু বৈধই নয় বরং তা প্রশংসনীয় বটে।"

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ্ আল-উসাইমিন এর অভিমতঃ

শাইখকে (আল্লাহর তা'আলা তাঁর প্রতি রহমত বর্ষন করুন) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল[১০৪],

"সম্মানিত শাইখ! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে হিফাজত করুন, বুধবারের যে ঘটনাটি ঘটেছিল তা অবশ্যই আপনি অবগত আছেন ... সেখানে একজন মুজাহিদ বিশ জনেরও বেশী ইহুদীকে হত্যা করে, এবং আরো পঞ্চান্ন জন্য ইহুদী আহত হয়। সেই মুজাহিদ নিজের শরীরের মধ্যে বিস্ফোরক বেধে ইহুদীদের একটি অনুষ্ঠানের ভিতরে ঢুকে পড়ে এবং পরবর্তীতে সে বিস্ফোরণ ঘটায় ... তাই এ ধরনের আক্রমণকে কি আত্মহত্যা বলা হবে নাকি জিহাদ?"

শাইখ জবাবে বললেনঃ

"সেই যুবকটি যে কাজ করেছিল ... সে নিজেই প্রথমে নিহত হয়েছিল? সে নিজেকে হত্যা করেছিল ... সুতরাং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সে নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ ছিল। তাই এ ধরনের পরিস্থিতিতে এটি বৈধ নয়, কেবল যদি এর দ্বারা ইসলামের বড় ধরনের কোন লাভ হয়, তখনই এ ধরনের কাজ করা বৈধ। তবে কতক লোক হত্যা বা কোন ইহুদী নেতা জখম করা উদ্দেশ্য হলে বৈধ নয়।

কিন্তু এতে যদি ইসলামের বড় কোন উপকার এবং বিরাট লাভ থাকে, তাহলে তা অবশ্যই অনুমোদিত। শাইখ আল-ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ্ (রহীমাহুল্লাহ) এ বিষয়ে প্রমাণ দিয়েছেন এবং তিনি এ ক্ষেত্রে সূরা বুরূজের বালকটিকে উদাহরণ হিসেবে দেখিয়েছেন।

বালকটি ছিল ঈমানদার, সে এমন একটি জাতির মধ্যে বসবাস করত যেখানে কাফির, মুশরিকরা রাজ্য পরিচালনা করত ... [এভাবে শাইখ আস্হাবে উখদুদের ঘটনার কথা উল্লেখ করেন]।

শাইখ আল-ইসলাম বলেছেন, *"এর দ্বারা (বালকটি নিজেকে হত্যা করার মাধ্যমে) ইসলামের এক বিরাট উপকার হয়েছে।"* এটি সুস্পষ্ট বিষয় ছিল যে, বালকটি নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল, এ ক্ষেত্রে কোন সন্দেহই ছিল না। কিন্তু তার নিজেকে হত্যা করার মাধ্যমে একটি বড় কল্যাণ অর্জিত হয়েছিল ...কিন্তু এভাবে দশ, বিশ অথবা ত্রিশজন ইহুদীকে মেরে কোন লাভ নেই ... কারণ এতে হতে পারে ইহুদীরা আবার প্রতিশোধ স্বরূপ আরো এক'শ মুসলিমকে হত্যা করতে পারে।"

সুতরাং শাইখের এই মন্তব্য থেকে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে, তার মত হচ্ছে এ ধরনের আক্রমন করার পূর্বে অবশ্যই সঠিকভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন যে, এর মাধ্যমে কতটুকু কল্যাণ আসবে। তাই এ ক্ষেত্রে এমন সিদ্ধান্তকে বেছে নেয়া প্রয়োজন, যাতে ইসলামের সর্বোচ্চ সুবিধা অর্জিত হয় এবং কুফ্ফারদের সর্বাধিক ক্ষতি সাধিত হয়। তাই শাইখ এই ধরনের

---

[১০৪] 'আল-লিক্বা আশ-শাহরী' ক্যাসেটের ধারাবাহিক সিরিজের # ২০ নং পার্ট-এর ৫:১৬ মি. শাইখ এটি বলেছেন।

আক্রমনের ক্ষেত্রে বাহ্যিক ফলাফলকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সুতরাং যদি এর দ্বারা মুসলিমদের বিশাল কোন উপকার হয় এবং তাওহীদের পতাকা উড্ডয়ন হয়, তাহলে এটি বৈধ। কিন্তু যদি তা না হয়, বরং মুসলিমদের আরো বড় ধরণের ক্ষতির আশংকা থাকে, তাহলে তা বৈধ নয়। তা অবশ্যই নির্ভর করে জিহাদের বিষয়ে যিনি অভিজ্ঞ মুজাহিদ কমান্ডার তার উপর, কারণ তিনি এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবেন।

শাইখ সুলাইমান আল-উলওয়ান এর অভিমতঃ

শাইখ সুলাইমান আল-উলওয়ান (আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মুক্তিকে তরান্বিত করুন) -কে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল,

"সম্মানিত শাইখ (আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে রক্ষা করুন)! আপনি ভাল করে অবগত আছেন যে, ফিলিস্তিনের মধ্যে ইহুদীরা মুসলিমদের উপর নির্মমভাবে নির্যাতন চালাচ্ছে আর তখন আরব দেশগুলো চুপ করে বসে আছে। তাই এরূপ পরিস্থিতিতে কি ইহুদীদের বিরুদ্ধে ফিদায়ী আক্রমণ চালানোর ক্ষেত্রে শারীয়াহর দিক থেকে কি কোন বাধা আছে?"

শাইখের জবাবঃ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম ...

নির্দয় ইহুদীরা তাদের শত দোষ ত্রুটি থাকার পরেও নির্লজ্জের মত একত্রিত হচ্ছে এবং তাদের কুকর্মগুলোকে একত্রিত করছে। তারা হচ্ছে আল্লাহ্, তাঁর দ্বীন এবং মুসলিমদের জঘন্যতম শত্রু। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾

"অবশ্যই তোমরা ঈমানদারদের সাথে শত্রুতার ব্যাপারে ইহুদী ও মুশরিকদেরই বেশী কঠোর (দেখতে) পাবে, (অপরদিকে) মু'মিনদের সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারে তোমরা সেসব লোককে (কিছুটা) নিকটতর পাবে, যারা বলেছে আমরা খৃষ্টান; এটি এই কারণে যে, (তখনো) তাদের মধ্যে ধর্মীয় পন্ডিত ব্যক্তি ও সংসারবিরাগীরা মজুদ ছিলো, অবশ্যই এ ব্যক্তিরা অহংকার করে না।"[১০৫]

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করাকে বাধ্যতামূলক করেছেন, যাতে আল্লাহর কালিমা সবার উপরে থাকে এবং কুফ্‌ফারদের কালিমাকে সর্বনিম্নে নিক্ষিপ্ত করা হয়। এটি ততক্ষণ চলতে থাকবে, যতক্ষণ তারা তাদের চুক্তি ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে এবং মুসলিমদের ভূমি ও সম্পদ গুলোকে অবৈধভাবে দখল করবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾

"যাদের ইতিপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান আনে না, পরকালের উপর ঈমান আনে না, আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূল যা কিছু হারাম করেছেন তা হারাম বলে স্বীকার করে না, (সর্বোপরি)

---

[১০৫] সূরা মায়েদাঃ ৮২

সত্য দ্বীনকে (নিজেদের) জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাও, যে পর্যন্ত না তারা পদানত হয়ে স্বেচ্ছায় জিযিয়া (কর) দিতে শুরু করে।"[১০৬]

অথচ যখন আল্লাহর শত্রুরা মুসলিমদের গর্দানের উপর তরবারি রেখে তাদের শিশু এবং বৃদ্ধদেরকে ভয় দেখাচ্ছে এবং জবর-দস্তি করে দখল করে নিচ্ছে তাদের বাড়িঘর ও ভূমিগুলোকে এবং লুণ্ঠন করছে তাদের সম্মান, তখন প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলিমের উপর তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। তাদের রক্ত ঝরানো এবং অপ্রতিরোধ্যভাবে এই জিহাদ চালিয়ে যাওয়া উচিত, যতদিন পর্যন্ত ফিলিস্তিন এবং অন্যান্য মুসলিম ভূমিগুলো তাদের কব্জা থেকে মুক্ত না করা হয়। শারীয়াহ্ থেকে এটি বৈধ নয় যে, মুসলিমদের কোন একটি ভূ-খন্ডও তাদের হাতে সোপর্দ করা হবে অথবা তাদের সাথে এ বিষয়ের উপর শান্তি চুক্তি করবে, কারণ তারা হচ্ছে এমন একটি প্রতারক জাতি যারা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে।

বর্তমানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, মুসলিমরা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে, তাদেরকে ধ্বংস করতে এবং পবিত্র ভূমিগুলো থেকে তাদেরকে বিতারিত করতে অক্ষম, তাই এজন্য সবচেয়ে উত্তম সমাধান হচ্ছে এই বানর ও শুকরের বংশধরদের বিরুদ্ধে আমরা ফিদায়ী আক্রমণ চালাবো এবং ঈমানের টানে ও প্রশংসনীয় উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের আত্মাকে কুরবানী করব, যাতে কুফ্‌ফারদের জান ও মালের এত বিশাল ক্ষতি দেখে তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়। ফিদায়ী আক্রমণের বৈধতার বিষয়ে অনেক দলিল-প্রমাণই রয়েছে, আমি অন্য আরেকটি গ্রন্থে এ বিষয়ের উপর দশটি দলিল উল্লেখ করেছি, আমি সেখানে এর সুফলের একটি তালিকা করেছি এবং যাঁরা এ অভিযান চালায় তাদের মর্যাদা নিয়েও আলোচনা করেছি।

মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾

"এ মানুষদের ভেতর (আবার) এমন কিছু লোকও রয়েছে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার (এতটুকু) সন্তুষ্টি লাভের জন্যে নিজের জীবন (পর্যন্ত) বিক্রি করে দেয়, আল্লাহ্ তা'আলা (এ ধরনের) বান্দাদের প্রতি সত্যিই অনুগ্রহশীল।"[১০৭]

এই আয়াতের ব্যাপারে সাহাবীগণ এবং তাবে'য়ীগণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, এটি একটি মজবুত প্রমাণ তাঁর ব্যাপারে, যে নিজের আত্মাকে বিক্রয় করতে চায় আল্লাহর কাছে এবং কুফ্‌ফারদের বাহিনীতে একাকী ঢুকে পরে, যদিও সে নিশ্চিত যে এতে তার মৃত্যু অবধারিত। এ ব্যক্তিই হচ্ছে মুহসীন এবং সে তার প্রতিপালকের কাছ থেকে তার ধৈর্য্য এবং শাহাদাতের জন্য অনেক বড় পুরস্কার সে লাভ করবে।

---

[১০৬] সূরা তাওবাহ্ঃ ২৯

[১০৭] সূরা বাকারাহ্ঃ ২০৭

সহীহ মুসলিম থেকে শোআইব (রদিআলাহু আনহু) থেকে বর্ণিত রসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন, “তোমাদের পূর্বে একজন রাজা ছিল এবং তার সভায় একজন যাদুকর ছিল। যখন যাদুকর বয়স্ক হল তখন সে রাজাকে বলল, “আমি বুড়ো হয়ে গেছি; আমার কাছে একটি ছেলে (ছাত্র) পাঠিয়ে দিন যেন আমি তাকে যাদু শিখাতে পারি ... ।” এভাবে হাদীসের শেষ পর্যন্ত।

ছেলেটি রাজাকে বলল, *“আমি যেভাবে বলি সেভাবে না করলে তুমি কখনও আমাকে মারতে পারবে না?”* রাজা বলল, *“সেটা কি?”* ছেলেটি বলল, *“আমাকে গাছের সাথে বাঁধ। সব লোকদের সমতল জায়গায় জড়ো কর এবং তূন থেকে যেকোন একটি তীর নাও এবং ধনুকে তা স্থাপন কর। তারপর বল, ‘এই ছেলের রব আল্লাহ্‌র নামে’, তারপর আমার প্রতি তীর নিক্ষেপ কর। এভাবে করলে তুমি আমাকে মারতে পারবে।”*

রাজা ছেলেটির কথা মত লোক জড়ো করল, ছেলেটিকে গাছের সাথে বাঁধল এবং ছেলেটির কপালে আল্লাহ্‌র নামে তীর নিক্ষেপ করল। তীরটি ছেলেটির কপালে বিঁধল। এবং ছেলেটি তার হাত তার কপালে রাখল এবং মারা গেল। তখন লোকেরা বলতে লাগল, *“আমরা ছেলেটির রবের প্রতি ঈমান আনলাম......... ।”*

রাজাকে তখন বলা হল,*“তুমি কি দেখছ যে তুমি যা ভয় করতে তাই হয়েছে। তুমি যা ভয় করতে আল্লাহ্‌র হুকুমে তাই হয়েছে। লোকেরা ছেলেটির রব আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছে।”* রাজা তার লোকদের সকল রাস্তার সম্মিলনে একটি বড় গর্ত তৈরী করার জন্য আদেশ করলো। গর্ত তৈরী করার পর তাতে আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হল এবং রাজা বলল, *“যে তাদের পুরাতন ধর্মে ফিরে না যাবে তাদেরকে আগুনে ফেলা হবে অথবা তারা নিজেরা যেন আগুনে ঝাঁপ দেয়।”*

লোকেরা আগুনে পড়তে লাগল এবং একজন মহিলা আসল তার কোলে তার শিশু ছিল এবং সে দ্বিধাগ্রস্থ ছিল। সেই কোলের বাচ্চা তাকে বলল, “হে মা! তুমি ধৈর্য্যধারণ কর, কারণ তুমি সত্যের উপর আছ।”[১০৮]

এটি হচ্ছে মুজাহিদীনদের পক্ষে একটি প্রমাণ, যারা আল্লাহর পথে ইহুদী, খ্রিষ্টান এবং পৃথিবীর বুকে যারা অশান্তি সৃষ্টি করছে তাদের বিরুদ্ধে শহীদী আক্রমন চালানোর মাধ্যমে জিহাদ করে যাচ্ছে।

কারণ, বালকটি নিজেই তাঁর মৃত্যুর পথ দেখিয়ে দিয়েছিল, এর পূর্ব পর্যন্ত রাজা সৈন্যদের সাহায্য সহযোগিতা নিয়েও তাঁকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তাই বালকটির এই পথ দেখানোর দ্বারা সে নিজেই তার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল এবং হত্যা করার কাজে শরীক ছিল। এর দ্বারা এটিই প্রমাণিত হয় যে, বালকটির সামগ্রিক কাজটি ছিল শাহাদাহ অর্জন এবং এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, পরোক্ষভাবে বালকটি নিজেই নিজেকে হত্যা করেছিল, যা প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে হত্যা করার বিধানের মধ্যে পড়ে।

[১০৮] সহীহ মুসলিম (১৩০), আহমাদ (৬/১৭), আল-তিরমীজি (৩৪০) এবং নাসাঈ তাঁর ‘তুহফাত আল-আশরাফ’ অনুচ্ছেদের (৪/১৯৯)। আত-তিবয়ান পাবলিকেশন্স-এর ‘পরিখা খননকারী জাতি’ এই বইটিতে পুরো হাদিসটি ব্যাখ্যা করেছেন।

এই উভয় কাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে (বালকটি এবং ফিদায়ী আক্রমণকারী) হক্বকে বিজয়ী ও সর্বোচ্চে তুলে ধরা এবং ইহুদী, খ্রিষ্টান, মুশরিক এবং তাদের সমর্থনকারীদের, যারা মুসলিমদের অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের শক্তিকে দূর্বল করা এবং তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করা।

এতে সুবিধা হচ্ছে মুজাহিদীনদের মধ্য থেকে এক অথবা একাধিক ব্যক্তি নিজের জীবনকে বিসর্জন দেয়ার মাধ্যমে কুফ্‌ফারদের একটি বড় ধরনের ক্ষতি সাধন করছে অথবা তাদের অন্তরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করছে কিংবা তাদের শক্তিকে দূর্বল করে দিচ্ছে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ...﴾

"তাদের (সাথে যুদ্ধের) জন্যে তোমরা যথাসাধ্য সাজ-সরঞ্জাম, শক্তি ও ঘোড়া প্রস্তুত কর[১০৯] এবং এ দিয়ে তোমরা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের দুশমনদের ভীত-সন্ত্রস্ত[১১০] করে দেবে ...।"[১১১]

অধিকাংশ আলিমই এটি অনুমোদন করেছেন যে, একজন মুসলিম কাফিরদের একটি বিশাল বাহিনীর ভেতরে ঢুকে যেতে পারে, যদিও সে নিশ্চিত যে এর মাধ্যমে তার মৃত্যু হতে পারে এবং এ বিষয়ের উপর অনেক দলীল-প্রমাণ রয়েছে।

[১০৯] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় শাইখ আব্দুর রহমান আল-সাদি (রঃ) বলেনঃ এর অর্থ হচ্ছে আপনি প্রস্তুতি নিতে সক্ষম এমন সব কিছু এর মধ্যে অর্ন্তভূক্ত, বুদ্ধিমত্তা হতে শুরু করে শারীরিক শক্তি পর্যন্ত; অর্থাৎ সকল ধরনের অস্ত্রশস্ত্র যা যুদ্ধ ক্ষেত্রে কুফ্‌ফারদের বিরুদ্ধে লড়তে সাহায্য করে; এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যবহৃত গোলন্দাজ যেমন মেশিনগান, বুলেট, উড়োজাহাজ, স্থল ও পানি পথে ব্যবহৃত যান, ট্যাঙ্ক, পরিখা, আত্ম-রক্ষামূলক ব্যবস্থা; পরামর্শ ও কূটনৈতিক পদক্ষেপ যা কুফ্‌ফারদের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে এবং মুসলিমদের অগ্রগামী হতে সাহায্য করে; সাহসীকতা, নির্ভীকতা, লক্ষ্য বস্তু আঘাতের অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করা, পরিকল্পনা ও সাংগঠনিক দক্ষতা অর্জনের শিক্ষা দেওয়া... এগুলো প্রশিক্ষণ নেওয়া তখনইওয়াজিব হয়ে যায় যখন এই দক্ষতা ব্যতিত উপরোক্ত প্রস্তুতি অর্জন সম্ভব নয়- (এটা *ফিক্‌হ* এরএকটি *উসুল*)। *"কোন ওয়াজিব কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কাজ সম্পন্ন করাও ওয়াজিব হয়ে যায়।"* উক্তিটি তাফসীর আল-কারিম আর-রহমান (২৮৫-২৮৬ পৃষ্ঠা) থেকে নেয়া হয়েছে।

[১১০] শাইখ আব্দুল্লাহ আয্‌যাম (র) এক খুত্‌বায় বলেছেন, "আমরা হচ্ছি জঙ্গী, আর আল্লাহ্‌র কিতাব ও নবীর সুন্নাহ্ অনুযায়ী জঙ্গীবাদ *ফারিদাহ্* (ওয়াজিব)। পূর্ব ও পশ্চিম সাক্ষী থাকুক যে আমরা জঙ্গী। মহান আল্লাহ্ বলেছেন: "তোমারা সমস্ত শক্তি দিয়ে -যুদ্ধের ঘোড়া সহ- তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাক, যাতে আল্লাহ্‌র শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে (জঙ্গীবাদের মাধ্যমে) আতঙ্কীত করতে পার"- কাজেই জঙ্গীবাদ (*ইরহাব*) আল্লাহ্‌র দীনে ওয়াজিব (*ফারিদাহ্*)।" অতএব, যে ফারদ্ কে প্রত্যাখ্যান করবে, ইজমা অনুযায়ী সে কাফের হয়ে যাবে। শাইখ আব্দুল কাদির ইবন্ আব্দুল আজিজ (আল্লাহ্ তাকে দ্রুত মুক্তি দান করুক) কারাবন্দী হওয়ার আগের শেষ বায়ান "হাত্তা বায়ানুন লীন-নাস: আল-ইরহাবু মিন আল-ইসলাম ওয়া মান আনকারা য়ালিকা ফাক্বাদ কাফার" নামক বইয়ের ৩য় পৃষ্ঠায় বলেছেন: "প্রথমত: জঙ্গীবাদ ইসলাম থেকে এসেছে, কাজেই যে এটাকে অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে। কারণ এটা তাঁর (*আল-আ'লা*) বাণী: **"তোমারা সমস্ত শক্তি দিয়ে -যুদ্ধের ঘোড়া সহ- তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাক, যাতে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে (জঙ্গীবাদের মাধ্যমে) আতঙ্কীত করতে পার"**। [সুরা আনফাল:৬০] কাজেই, এই স্পষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে এটাই বুঝা যায় যে, জঙ্গীবাদের মাধ্যমে কাফের শত্রুদেরকে আতঙ্কীত করা হচ্ছে শরীয়তের দায়িত্ব। আর যে এটাকে অস্বীকার করে সে কুফরি করল, কারণ তিঁনি বলেন: **"কাফের্‌রা ছাড়া আমার আয়াত কেউ অস্বীকার করে না।"** [আনকাবূত:৪৭]। (আরবী আয়াতে উল্লেখিত) জুহুদ অর্থ হচ্ছে প্রত্যাখ্যান এবং জিহ্বা এর মাধ্যমে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। তিঁনি বলেন: "যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা কথা গড়ে অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তাকে অস্বীকার করে, তার কি স্মরণ রাখা উচিত নয় যে, জাহান্নামই সেসব কাফেরের আশ্রয়স্থল হবে?" [আনকাবুত:৬৮]। অতএব, যে দাবী করে যে ইসলামে জঙ্গীবাদের স্থান নেই অথবা এ দুটোর মাঝে পার্থক্য করতে চায়, তাহলে সে কুফরি করল। অর্থাৎ ইসলামের মধ্যে জঙ্গীবাদ আছে। আর এর মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন যে, যারা জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চায় তারা মূলত ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চায়। জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ - তারা শুধুমাত্র জাহেলদের কাছ থেকেই এ ধ্রুব সত্য লুকাতে সক্ষম হয়।

[১১১] সূরা আনফালঃ ৬০

অধিংকাশ আলিম এই বিষয়টিকেও অনুমোদন দিয়েছেন যে, যদি কাফিররা কোন মুসলিম বন্দীকে ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করে, এবং তাদের ক্ষতি থেকে বাঁচার আর কোন পথ না থাকে, তাহলে সেই মুসলিমকে হত্যা করা বৈধ। তখন হত্যাকারী মুজাহিদের মর্যাদা পাবে এবং নিহত (মুসলিম বন্দী) ব্যক্তি পাবে শহীদের মর্যাদা। আল্লাহ্‌ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

তোমার ভাই,

সুলাইমান ইবন নাসির আল-উলওয়ান

বুরাইদাহ, আল-কাসিম, ১০/০৭/১৪২১

সার সংক্ষেপ

এই বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা থেকে আমরা এই পর্যায়ে উপনীত হয়েছি যে, শহীদী আক্রমন করা বৈধ, এটি শুধু বৈধই নয় বরং যে মুজাহিদ এর মাধ্যমে শহীন হন, তিনি ঐ মুজাহিদের চেয়ে উত্তম যে যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়েছে, যদিও তারা উভয়েই শহীদের মর্যাদা পাবে। এই মর্যাদা তাদের ঝুঁকি নেয়ার স্তর এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে।

এটি সুস্পষ্ট অথবা এছাড়া আর কি কারণে ঐ ব্যক্তিকে শহীদদের নেতা হামজা (রদিআল্লাহু আনহু)-এর সমমর্যাদা দেয়া হয়েছে, যিনি জালেম শাসকের সম্মুখে হক্ক কথা বলে এবং তাকে সৎ কাজের আদেশ দেয় ও অসৎ কাজের নিষেধ করে আর এ কারণে ঐ শাসক তাঁকে হত্যা করে। কি কারণে হামজা (রদিআল্লাহু আনহু)-এর সাথে তাঁকে শহীদদের নেতা বানানো হয়েছে? এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, তাঁর সাথে আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোন সমর্থক ছিল না, ভীতি এবং কঠিন পরিস্থিতির উপর দিয়ে তাঁকে একাই চলতে হয়েছিল, যার স্বাদ অধিকাংশ মুজাহিদীনই পান নি। সুতরাং প্রত্যেক মুজাহিদেরই ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা রয়েছে যা নির্ভর করে তিনি কতটুকু চেষ্টা করেছেন এবং কিভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?

আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি ফিদায়ী আক্রমণে মুজাহিদীনদের সর্বনিম্ন শক্তি ব্যয় হয় আর এতে কুফ্‌ফার শত্রুদের সর্বোচ্চ ক্ষতি সাধিত হয়। আমরা জানতে পেরেছি যা আপনাদেরও জানা থাকার কথা যে, আলিমগণের মধ্যে অনেকেই এ ধরনের আক্রমণের বৈধতার বিষয়ে রায় দিয়েছেন এবং কমপক্ষে ৩০জন আলিম এর পক্ষে রায়[১১২] দিয়েছেন। আমরা পূর্বে এ কথাটিও

[১১২] এর মধ্যে কিছু আলিমের নাম এখানে উল্লেখ করা হল যারা 'ফিদায়ী আক্রমন'-এর পক্ষে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সমর্থন দিয়েছেন, আর তাঁরা হলেনঃ ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহীম আল আশ-শাইখ, ইমাম হামুদ আল-উক্বলা আশ-শুয়াইবী, শাইখ ইবন আল-উসাইমিন, শাইখ আল-আলবানী, শাইখ সুলাইমান আল-উলওয়ান, শাইখ আলী আল-খুদাইর, শাইখ নাসির আল-ফাহাদ, শাইখ হামিদ আল-আলী, শাইখ আবু কাতাদাহ আল-ফিলিস্তিনী, শাইখ আইমান আল

উল্লেখ করেছিলাম যে, এই ধারণাটি এসেছে একজন ব্যক্তি একাকী শত্রুদের বিশাল বাহিনীর ভেতরে প্রবেশ করা থেকে, যদিও সে প্রায় নিশ্চিত যে তাকে হত্যা করা হবে। এ ধরনের কাজকে ফুকাহাদের মধ্যে অনেকেই প্রশংসনীয় বলে উল্লেখ করেছেন।

অত:পর এ বিষয়ে আমরা আরো বলব যে, ফিদায়ী আক্রমণ চালানো ঐ ক্ষেত্রেও অনুমোদিত যদি তাঁর নিয়্যত সঠিক থাকা সত্ত্বেও বড় ধরনের কোন ফলাফল না পাওয়া যায়; তবে এই আক্রমন চালানো উচিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না নিম্নোক্ত কারণগুলো পাওয়া যায়ঃ

১. তাঁর নিয়্যত অবশ্যই এ বিষয়ে বিশুদ্ধ থাকতে হবে যে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কালিমাকে উঁচু করা এবং জিহাদকে আরো শক্তিশালী করার জন্য এ কাজটি করছেন।

২. তাঁকে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে, শত্রুদের শক্তিকে দূর্বল অথবা ক্ষতি করার জন্য তাঁর নিজের জীবনকে বিসর্জন করা ছাড়া তাঁর কাছে বিকল্প আর কোন উপায় নেই।

৩. তাঁকে এ বিষয়টিতেও নিশ্চিত হতে হবে যে, এ কাজের মাধ্যমে শত্রুদের বড় ধরনের ক্ষতি সাধিত হবে অথবা তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, অপরদিকে মুসলিমদের আত্মবিশ্বাস আরো বাড়বে।

৪. তাঁকে অবশ্যই তাঁর আমির, যিনি এ বিষয়ে বেশি অভিজ্ঞ তাঁর সাথে পরামর্শ করে এ কাজ করা উচিত, অন্যথায়, তাঁর এই কাজের কারণে হতে পারে মুজাহিদীনদের একটি বড় পরিকল্পনা ভন্ডুল হয়ে যাবে অথবা শত্রুরা সময়ের পূর্বেই সতর্ক হয়ে যেতে পারবে।

প্রথম শর্তটি যদি পাওয়া না যায় তাহলে পুরো কাজটিই মূল্যহীন হয়ে যাবে, কিন্তু যদি তা পূরণ করার পরে অন্য কিছু শর্ত বাদ পড়ে, তাহলে তা উত্তম বলা যাবে না, তবে এর মানে এই নয় যে, সে মুজাহিদকে শহীদ বলা যাবে না।

আমরা ইতিপূর্বে এ বিষয়টিও উল্লেখ করেছিলাম যে, একজন ব্যক্তি যদি পরোক্ষভাবে নিজেকে হত্যা করে, তাহলে তার বিধান ঐ ব্যক্তির সমপর্যায়ে হবে যে প্রত্যেক্ষভাবে নিজেকে হত্যা করেছে। তাই এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায়, ফিদায়ী আক্রমন হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মত যে তার বর্ম পরিধান করা ছাড়াই শত্রু বাহিনীর ভেতরে প্রবেশ করে, যদিও সে প্রায় নিশ্চিত যে, এতে তার মৃত্যু হতে পারে। উভয় পরিস্থিতিতেই তারা তাদের নিজেদের মৃত্যুর পরোক্ষ কারণে পরিণত হয়, কিন্তু তবুও তাদের পরিস্থিতি এবং নিয়্যতের কারণে এই কাজটি প্রশংসনীয়, তাই একে কোন ভাবেই 'আত্মহত্যা' বলে আখ্যায়িত করা যাবে না।

যাওয়াহিরী, শাইখ আবু উমার আস-সাইফ, শাইখ আজিল ইবন জসীম আন-নাশমী, শাইখ আহমাদ আব্দুল-কারীম নাজীব, শাইখ সুলাইমান ইবন মুনাইঈী এবং সুদানের ইসলামিক ফিকাহ্ অরগানাইজেশন এবং ফিলিস্তিনের উলামা কাউন্সিল এ রকম আরো অনেকে।

আমরা এ বিষয়টিও উল্লেখ করেছি (অধিকাংশ আলিমের মতে) ‘কার হাতে সে মারা গেল’ এ দ্বারা সেই মুজাহিদের শহীদ হওয়ার মর্যাদার কোন পার্থক্য হবে না। এ ধরনের সন্দেহমূলক ধারণা দূর করা উচিত যে, সে নিজেই নিজের জীবনকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। নিয়্যত এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে এ ধরনের কাজ শারীয়াহর পাঁচ ধরনের স্তরের মধ্যে একটি হতে পারে (অর্থাৎ বাধ্যতামূল, মুস্তাহাব, মুবাহ্, মাকরূহ এবং হারাম)[১১৩]।

পরিশেষে আমরা বলব, নিজের জীবনকে আত্মহরণ করা সব ক্ষেত্রেই নিন্দনীয় নয়, বরং এর পিছনে কি কারণ ছিল তার উপরে এটি নির্ভর করে। তাই আমরা পরিসমাপ্তিতে বলতে পারি, যদি কেউ নিজেকে হত্যা করে তাঁর ঈমানের দৃঢ়তা, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সালাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সালাম)-এর প্রতি ভালোবাসা, দ্বীনের কোন বৃহত্তর স্বার্থ অথবা তাওহীদের পতাকাকে উত্তোলন করার জন্য, তাহলে এ ধরনের কাজ অবশ্যই প্রশংসনীয়।

[১১৩] ফিকাহ্ শাস্ত্রের পাঁচটি নিয়ম যা সবারই জানাঃ ওয়াজিব, মান্দুব, মুবাহ্, মাকরূহ্ এবং হারাম।